কে!

হেমেন্দ্রকুমার রায়

BENGALIEBOOK.COM
BE
বেঙ্গালিইবুক.কম
bengaliebook.com
বেঙ্গালিইবুক.কম
বেঙ্গালিইবুক.কম
bengaliebook.com
বেঙ্গালিইবুক.কম
★2022★

কে!

নতুন মামলা

মবে ফুটি-ফুটি করছে ভোরের আলো। কলকাতায় গড়ের মাঠ।

গাছে-গাছে বিহঙ্গদের ঐকতান। এখানে ওখানে অশ্বচালনা করছে পাঞ্জাবি ঘোড়সওয়াররা। প্রাতভ্রমণে বেরিয়েছে আরও অনেকে এবং তাদের মধ্যে দেখা যাচ্ছে আমাদের পরিচিত তিনটি মানুষকে সাধের গোয়েন্দা জয়ন্ত আর মানিক ও পুলিশ কর্মচারী সুন্দরবাবু।

শরৎ ঋতুর জন্যে আসর ছেড়ে দেবার আগে শেষ-বর্ষা যথেষ্ট বিক্রম প্রকাশ করে গিয়েছে গতকল্য রাত্রে। সারা শহরটা ঘণ্টা কয়েক ধরে স্নান করেছে এমন ঘন বৃষ্টিধারায় যে, পথের আর মাঠের অনেক জায়গাতেই এখনও থইথই করছে ঘোলাটে জল। রাত দুটোর পরে বৃষ্টি থেমেছে বটে, কিন্তু গড়ের মাঠ এখনও প্রাতভ্রমণের উপযোগী হয়ে ওঠেনি।

তবু প্রভাতী ভ্রমণে যারা অভ্যস্ত এ সময়টায় তারা ঘরের চার দেওয়ালের মধ্যে বন্দি হয়ে থাকতে চায় না। জয়ন্ত আর মানিক হচ্ছে এই জাতীয় জীব। কেবল সূর্যোদয়ের আগে নয়, সূর্যাস্তের পরেও একবার মুক্ত আকাশ বাতাসের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপন করতে না পারলে তারা যেন আত্মস্থ হতে পারে না।

এ বাতিক কোনওদিনই ছিল না সুন্দরবাবুর। কিন্তু ইদানীং তাঁর উদরদেশের বিপুলতা এতটা বেড়ে উঠেছে যে, চিকিৎসকরা পরামর্শ দিয়েছেন, নিয়মিতভাবে প্রত্যহ কিঞ্চিৎ ব্যায়াম- অর্থাৎ অন্তত মাইলদুয়েক পদব্রজে ভ্রমণ করতে। তাই ইচ্ছার বিরুদ্ধেও আজকাল তাকে হতে হয়েছে জয়ন্তদের ভ্রমণের সঙ্গী।

ভুড়ির দ্বারা ভারাক্রান্ত সুন্দরবাবু কিছুক্ষণ পদচালনা করবার পর শ্রান্ত স্বরে বললেন, মানিক, পথের আর মাঠের অবস্থা দেখছ তো?

–দেখছি।

–আজ আমি কিছুতেই বেড়াতে আসতুম না।

–তবে এলেন কেন?

–তোমাদের উৎপাতের দায়ে পড়ে। ভোর হতে না হতেই, কাক-চিল না ডাকতেই, বাসায় ঢুকে তুমি গাধার মতো যা ডাকাডাকি শুরু করলে। বাড়িতে ডাকাত পড়েছে ভেবে ছেলেমেয়েগুলো পর্যন্ত চমকে জেগে উঠল। তোমার গর্দভ কণ্ঠকে রুদ্ধ করবার জন্যই আজ আমাকে তাড়াতাড়ি বাইরে বেরিয়ে আসতে হয়েছে।

মানিক মুখ টিপে হাসতে-হাসতে বললে, আমাকে গাধা বলে আপনি যদি খুশি হন, আমি আপত্তি করব না। কিন্তু বাইরে এসে কি দেখছেন না, আজকের দিনটির বিশেষত্ব?

–হুম! বিশেষত্বের মধ্যে তো দেখছি কেবল জল, কাদা আর পিছল পথ।

–আর কিছু দেখছেন না?

–উঁহু!

–তাহলে আপনার চোখের দোষ হয়েছে।

–চোখের কিছু দোষ হয়নি। তাহলে আমি চশমা পরতুম।

মানিক এদিক-ওদিক অঙ্গুলি নির্দেশ করে বললে, দেখছেন?

সুন্দরবাবু এদিকে-ওদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে হতভম্বের মতো বললেন, কিছুই দেখছি না তো!

–ভালো করে চেয়ে দেখুন, মাঠের যেখানে যেখানে জল জমেছে, সেইখানে স্বর্গ নেমে এসেছে মাটির কোলে।

-মানে?

–স্বর্গ বললে আমরা কোন দিকে তাকাই? আকাশের দিকে। দেখুন, মাঠের যেখানে যেখানে জল জমেছে, সেইখানে নেমে এসেছে টুকরো আকাশের সুন্দর নীলিমা। একটু পরেই দেখতে পাবেন ওখানে সাঁতার কাটছে কচিরোদের কাঁচা সোনালি আভা। আবার সন্ধ্যার পরে হয়তো ওখানে ফুটে উঠবে নতুন চাঁদের রুপোলি জ্যোৎস্নাও।

সুন্দরবাবু দুই ভুরু তুলে বললেন, উঃ ভয়ংকর কাব্যি!

জয়ন্ত এতক্ষণ নির্বাক মুখে অগ্রসর হচ্ছিল। হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে বললে, সুন্দরবাবু!

তার কণ্ঠস্বর শুনে সুন্দরবাবু সচমকে বললেন, কী জয়ন্ত?

আঙুল দিয়ে এক দিকে দেখিয়ে জয়ন্ত বললে, ওই গাছতলায় কী পড়ে আছে দেখছেন?

–একটা মানুষ শুয়ে আছে বলে মনে হচ্ছে! না, না, ওটা যে রক্তাক্ত দেহ!

–হুঁ। খুব সম্ভব ওটা মৃতদেহ! গড়ের মাঠে এমনধারা দৃশ্য নতুন নয়। এগিয়ে চলুন, ব্যাপারটা কী দেখা যাক!

সুন্দরবাবু একটা নিশ্বাস ফেলে বললেন, ব্যাপার আর কী, কেঁকি স্বর্গে গিয়েও ধান ভানে। মানিক এতক্ষণ আমাকে গড়ের মাঠে মাটির ওপরে স্বর্গ দেখাবার চেষ্টা করছিল। এখন সামলাও বাবা স্বর্গের ঠেলা, স্বর্গের বদলে ঘাড়ে হয়তো চাপল একটা নতুন খুনের মামলা।

মানিক বললে, সত্যি সুন্দরবাবু, আপনার সঙ্গে আমিও সহানুভূতি প্রকাশ করছি। এমন বৃষ্টিস্নাত অম্লান প্রভাত, মনে-মনে করছিলুম কাব্যালোচনা, চোখের সামনে দেখছিলুম

মাটির ফ্রেমে বাঁধানো জলের পটে নীলিমার ছবি, হঠাৎ কিনা রক্তাক্ত মৃত্যু এসে এক মুহূর্তে বিলুপ্ত করে দিলে সমস্ত সৌন্দর্য। নিয়তির পরিহাস আর কাকে বলে!

সকলে তখন গাছতলায় এসে দাঁড়িয়েছে। সেখানে মাটির ওপরে হাত পা ছড়িয়ে চিত হয়ে পড়ে রয়েছে একটা মানুষের নিশ্চেষ্ট দেহ। প্রথম দৃষ্টিতেই বোঝা যায়, সেটা মৃতদেহ ছাড়া আর কিছুই নয়। কারণ, তার মুখের অস্তিত্ব নেই বললেই হয় কপালের তলা থেকে চিবুক পর্যন্ত মুখের সমস্ত অংশটা একেবারে লুপ্ত হয়ে গিয়েছে, দেখা যাচ্ছে কেবল চাপ-বাঁধা রক্তের মধ্যে খানিকটা ছিন্নভিন্ন মাংস। বীভৎস দৃশ্য!

সুন্দরবাবু বললেন, হুম, আত্মহত্যার নয়, হত্যার মামলা!

জয়ন্ত বললে, কেউ ছররা ভরা শটগান ছুঁড়ে এই বেচারার মুখ উড়িয়ে দিয়েছে। আর বন্দুকটা ছোঁড়া হয়েছে কাছ থেকেই, নইলে মুখটা অমনভাবে উড়ে যেত না। সে বসে পড়ে মৃতদেহের ওপর হাত রেখে আবার বললে, দেহটা এখনও একেবারে ঠান্ডা হয়ে যায়নি। খুব সম্ভব এর মৃত্যু হয়েছে ঘণ্টাকয়েক আগেই।

সুন্দরবাবু বললেন, চারিদিকে কত রক্ত দেখেছ?

তার মানে একে হত্যা করা হয়েছে এইখানেই। ঘটনাটা ঘটেছে বৃষ্টি থামবার পরে কোনও এক সময়ে। নইলে কালকের প্রবল বৃষ্টিপাতে মৃতদেহের সমস্ত রক্ত ধুয়ে মুছে নিশ্চিহ্ন হয়ে যেত। রাত দুটোর আগে বৃষ্টি থামেনি। আমরা ঘটনাস্থলে এসেছি সকাল সাড়ে পাঁচটার পর। হত্যাকারী কাজ সেরেছে এর মধ্যে।

সুন্দরবাবু বললে, এটা হচ্ছে যুবকের লাশ। জুতো আর পরনের কাপড় দেখলেই বোঝা যায় ভদ্রবংশের যুবক। কিন্তু ওর গায়ে রয়েছে কেবল একটা গেঞ্জি। গভীর রাত্রে কেবল গেঞ্জি পরে ভদ্রবংশের কোনও যুবক কি গড়ের মাঠে বেড়াতে আসে?

–হত ব্যক্তিকে বোধহয় কোনও গাড়িতে করে এখানে আনা হয়েছিল। হত্যাকাণ্ডের পর হয়তো তার উপরকার জামাটা অপরাধী খুলে নিয়ে গিয়েছে!

–কেন?

সহজে যাতে শনাক্ত করা না যায়।

হেঁট হয়ে মাটির ওপর থেকে একখানা খাম তুলে নিয়ে তার ওপর চোখ বুলিয়ে বলল, কিন্তু খুব সম্ভব হত্যাকারী দেখতে পায়নি যে এই খামখানা মৃত ব্যক্তির জামার পকেট থেকে এখানে পড়ে গিয়েছে।

খামের ওপরে কারুর নাম আর ঠিকানা আছে?

–হ্যাঁ। শ্রীযুক্ত মণিমোহন বসু। দশ নম্বর বলাই শীল স্ট্রিট। কলিকাতা।

জয়ন্ত বললে, এটা একটা বড় সূত্র। ওটা হয় হত ব্যক্তির, নয় হত্যাকারীর নাম আর ঠিকানা! খামের ভিতর কোনও চিঠি আছে?

–আছে। এই যে! চিঠিখানা পড়ে মানিক বললে, বাজে চিঠি। শালিখার পঁচিশ নম্বর সুন্দর সেন রোড থেকে এক চন্দ্রনাথ রায় মণিমোহনকে তার সঙ্গে দেখা করবার জন্যে অনুরোধ করেছে।

বাজে চিঠি নয়, ওটাও কাজে লাগবে। সুন্দরবাবু, আপনার পায়ের কাছে একটা মানিব্যাগ পড়ে আছে না?

সুন্দরবাবু সেটা কুড়িয়ে নিয়ে বললেন, হ্যাঁ। কিন্তু ব্যাগের ভিতর খালি, ঢু-ঢু।

জয়ন্ত আশেপাশের জমি পরীক্ষা করতে করতে বললে, দেখছি বৃষ্টিভেজা মাটির ওপরে তিনজন লোকের আলাদা-আলাদা পায়ের ছাপ আছে। ধরলুম তিনজনের একজন হচ্ছে নিহত মণিমোহন! তাহলে আর দুজন কে? নিশ্চয়ই হত্যাকারী। সুন্দরবাবু, পদচিহ্নগুলোর প্লাস্টারের ছাপ তোলবার ব্যবস্থা করতে হবে।

সুন্দরবাবু খুশি মুখে বললেন, প্রথমেই যখন এতগুলো সূত্র পাওয়া গেল, তখন মামলাটার কিনারা করতে বেশি বেগ পেতে হবে না বোধহয়!

জয়ন্ত বললে, আরও একটা কথা বোঝা যাচ্ছে। ঘটনাস্থলে কোনও ধস্তাধস্তির চিহ্ন নেই। হত ব্যক্তি নিশ্চয়ই তার সঙ্গীদের চিনত, তাদের বিশ্বাস করত, নইলে রাত দুটোর পর গড়ের মাঠে এমন নির্জন জায়গায় তাদের সঙ্গে বিনা বাধায় আসতে রাজি হত না। আপাতত এই পর্যন্ত। সূর্য উঠেছে, চারিদিকে লোকের ভিড়, চলো মানিক, স্থানান্তরে প্রস্থান করি।

.

হেঁয়ালির মামলা

মণিমোহন বসু। দশ নম্বর বলাই শীল স্ট্রিট।

সুন্দরবাবু যথাস্থানে গিয়ে হাজির হয়ে দরজার কড়া নাড়তে লাগলেন।

বাড়ির ভিতর থেকে বেরিয়ে এলেন এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক। সুন্দরবাবুর ধরাচূড়া-পরা চেহারা দেখেই চমকে উঠল তাঁর দুই চক্ষু।

সুন্দরবাবু শুধোলেন, এ বাড়িতে মণিমোহন বসু বলে কেউ থাকে?

–থাকে। মণি আমার ছেলে।

–আপনার নাম কী?

–মহেন্দ্রমোহন বসু।

–মণিবাবুর সঙ্গে আমি দেখা করতে চাই।

–মণি কাল থেকে বাড়িতে ফেরেনি। তার জন্যে আমরা বড় ভাবছি। সে তো না। বলে বাইরে কখনও রাত কাটায় না।

বটে। আপনার ছেলের বয়স কত?

–আঠাশ।

–গায়ের রং?

–উজ্জ্বল শ্যাম।

–একহারা, কিন্তু বলিষ্ঠ দেহ?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

বাইরে যাবার সময়ে সে কীরকম পোশাক পরেছিল?

–সিল্কের পাঞ্জাবি। সরু কালোপেড়ে মিলের ধুতি। পায়ে ব্রাউন রঙের জুতো।

–আপনি অনুগ্রহ করে আমার সঙ্গে একটু আসবেন।

–কোথায়?

–মর্গে।

মহেন্দ্রের দুই চক্ষু বিস্ফারিত হয়ে উঠল। সবিস্ময়ে বললেন, মর্গে?

–আপনার জন্যে আমার দুঃখ হচ্ছে, কিন্তু না বলেও আর উপায় নেই। আজ আমরা একটা লাশ পেয়েছি। সেটা আপনার ছেলের দেহও হতে পারে!

মহেন্দ্রবাবু টলে পড়ে যাচ্ছিল, সুন্দরবাবু তাড়াতাড়ি দু-হাতে তাকে ধরে ফেললেন। তারপর বললেন, স্থির হোন মহেন্দ্রবাবু। আসুন আমার সঙ্গে। আমাদের অনুমান হয়তো সত্য। নয়!

শবাগারে গিয়ে সন্দেহ কিন্তু সত্য বলেই প্রমাণিত হল। যদিও শবের মুখ চেনবার উপায় নেই, তবু দেহটা পরীক্ষা করেই মহেন্দ্র সক্রন্দনে বলে উঠল, এ আমার মণিমোহন।

খানিক পরে শোকের প্রথম ধাক্কাটা সে যখন কতকটা সামলে নিলে, সুন্দরবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, আপনার ছেলে কী কাজ করত?

–মার্চেন্ট অফিসে চাকরি করত, কিন্তু আপাতত বেকার হয়ে বসেছিল।

–দেখুন মহেন্দ্রবাবু, আমাদের ধারণা, মণিমোহন যাদের হাতে মারা পড়েছে, সে তাদের চিনত। সে কীরকম লোকের সঙ্গে মেলামেশা করত, আপনি কি তা জানেন?

যতদূর জানি, আমার ছেলের অসৎ সংসর্গ ছিল না। সে নিজেও ছিল শান্ত-শিষ্ট, অতি ভদ্র, মেলামেশাও করত সেইরকম সব লোকের সঙ্গে।

তার কোনও ঘনিষ্ঠ বন্ধুকে আপনি চেনেন?

চিনি। তার সবচেয়ে ঘনিষ্ঠতা ছিল একজনের সঙ্গে, তার নাম নন্দলাল মিত্র।

–ঠিকানা?

–পাঁচ নম্বর রায় রোড।

–তার সম্বন্ধে আরও কিছু বলতে পারেন?

নন্দ বড় ভালো ছেলে। মণিরই সমবয়সি। কে সরকারের বিখ্যাত জুয়েলারি ফার্মের ক্যাশিয়ার।

–হুম! মণিমোহনের আর কোনও বন্ধুর কথা বলতে পারেন?

–বিশেষ কিছু খবর রাখি না। নন্দের মতো ঘনিষ্ঠ বন্ধু বলে আর কাউকে আমি জানি না। তবে হালে...

বলুন, থামলেন কেন?

হালে মণির সঙ্গে একটি লোকের আলাপ হয়েছে বটে। লোকটিকে আমার ভালো লাগত না।

–ভালো লাগত না কেন?

–প্রকৃতির কথা জানি না, তবে আকৃতি ছিল তার বিরুদ্ধে। অত্যন্ত কাঠখোট্টা চেহারা।

–তার নাম?

–চন্দ্রনাথ রায়।

নাম শুনেই সুন্দরবাবু জাগ্রত হয়ে উঠলেন অধিকতর। ঘটনাস্থলে যে পত্র পাওয়া গিয়াছে, তারও লেখকের নাম চন্দ্রনাথ রায়। তিনি বললেন, চন্দ্রনাথ কি শালিখার পঁচিশ নম্বর সুন্দর সেন রোডে থাকে?

–ঠিক ঠিকানা জানি না, তবে সে শালিখাতেই থাকে বটে।

তার দেহের একটু বর্ণনা দিন।

রং কালো। আর এক পোঁচ বেশি কালো হলেই সে আফ্রিকার কাফ্রিদের দলে গিয়ে ভিড়তে পারত। মাথায় ছয় ফুটের কাছাকাছি, রীতিমতো বলবান দোহারা দেহ। খাদা নাক, খুদে-খুদে চোখ, দৃষ্টি তীক্ষ্ণ। গোঁফ-দাড়ি কামানো। সর্বদাই কোট-প্যান্ট পরে আর হাতে থাকে একগাছা মোটা বাঘমারা লাঠি। বাঁ হাতের কড়ে আঙুলের আধখানা নেই।

–হুম! যে বর্ণনা পেলুম, ভিড়ের ভিতর থেকে চন্দ্রনাথকে চিনে নিতে দেরি লাগবে না। আচ্ছা মহেন্দ্রবাবু, কেবল চেহারার জন্যই কি আপনার চন্দ্রনাথকে ভালো লাগত না?

–না। তার গলার আওয়াজ যেমন কর্কশ, কথাবার্তাও তেমন রুক্ষ! তার সঙ্গে মেলামেশার পর থেকেই মণির প্রকৃতিও যেন একটু-একটু বদলে গিয়েছিল!

কীরকম?

–তার হাব-ভাব-ব্যবহার কিঞ্চিৎ রহস্যময় হয়ে উঠেছিল।

তার মানে?

–সে যেন সর্বদাই কী চিন্তা করত! বাড়ির কারুর সঙ্গে বেশি কথা কইত না, আমাকেও যেন এড়িয়ে-এড়িয়ে চলবার চেষ্টা করত! আমরা ভাবতুম, বেকার বসে আছে বলেই সে এমন মনমরা হয়ে আছে।

–তাও অসম্ভব নয় তো।

–খুব সম্ভব তাই। কিন্তু মণির আরও একটা পরিবর্তন আমরা লক্ষ করেছিলুম।

বলুন।

–মণি আগে সন্ধ্যার সঙ্গে সঙ্গেই ফিরে আসত। কিন্তু ইদানীং বাড়ি ফিরতে তার রাত দশ-এগারোটা হয়ে যেত।

কতদিন থেকে এটা লক্ষ করছেন?

–চন্দ্রনাথের সঙ্গে মণির আলাপ হওয়ার পর থেকে।

–চন্দ্রনাথের আবির্ভাব কত দিন?

–সে প্রথমে আমার বাড়িতে আসে মাস পাঁচেক আগে।

মহেন্দ্রবাবু, মৃতদেহের মুখ নেই বললেই হয়। ও দেহ যে আপনারই পুত্রের, সেটা ঠিক চিনতে পেরেছেন তো?

মহেন্দ্র ভগ্নস্বরে বললে, কোনও সন্দেহ নেই–কোনও সন্দেহ নেই। আমি বাপ, নিজের ছেলের দেহ চিনতে পারব না। সেই রং, সেই গড়ন, আঙুলে পলার আংটি, পায়ে সেই জুতো! পরনের কাপড়ে আমাদের ধোপার মার্কা। বেশ বুঝেছি মশাই, আমারই কপাল পুড়েছে। বলতে-বলতে কাঁদো কাঁদো হয়ে এল তার কণ্ঠস্বর।

সুন্দরবাবু মমতাভরা গলায় বললেন, নিয়তি বড় নিষ্ঠুর, তার বিরুদ্ধে অভিযোগ করে লাভ নেই মহেন্দ্রবাবু। আপাতত আমার আর কোনও জিজ্ঞাসা নেই, আপনি বাড়ি যেতে পারেন।

মহেন্দ্রের প্রস্থান। দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে সুন্দরবাবুর চিন্তা ও হুম্! শালখের চন্দ্রনাথ। রঙে কাফ্রি, নামে চন্দ্র কানা ছেলের নাম পদ্মলোচন। আকৃতি-প্রকৃতি নাকি সন্দেহজনক! এইবার তোমার দিকেই আমি পদচালনা করব।...

কিন্তু সুন্দরবাবুকে বেশি দূর পদচালনা করতে হল না। শবাগারের বাইরে আসতেই তিনি দেখলেন, একখানা মোটর এসে দাঁড়াল এবং গাড়ির ভিতর থেকে নেমে পড়ল একটি যুবক। তার মুখের ভাব উদ্বিগ্ন।

সে বললে, আপনিই তো সুন্দরবাবু!

-হুম!

–আমি আপনার কাছেই এসেছি।

–কেন?

–আমার ছোট ভাই নন্দলাল কাল সন্ধ্যার সময়ে বাড়ি থেকে বেরিয়েছে এখনও ফেরেনি। থানায় সেই খবর দিতে গিয়ে শুনলুম, আপনারা নাকি একটা মৃতদেহ পেয়েছেন। আমি দেহটা একবার দেখতে চাই।

সুন্দরবাবু শুষ্ক কণ্ঠে বললেন, সেটা দেখে কী হবে?

–দেহটা যদি নন্দের হয়?

–অসম্ভব! তা শনাক্ত হয়ে গিয়েছে।

–কে শনাক্ত করেছে?

যার লাশ, তার বাপ নিজে।

–ভগবান করুন, ও দেহ যেন অন্যেরই হয়। তবু দয়া করে আমাকে কি একটি বার দেখবার সুযোগ দেবেন না?

আরে বাবা, খুনের মামলা–যা আমার চোখের বালি। আমার মগজে এখন বোঁ বোঁ করে চরকি ঘুরছে, এ-সব বাজে ব্যাপার ভালো লাগছে না, আমি চললাম। বিরক্ত মুখে সুন্দরবাবু প্রস্থানোদ্যত হলেন।

যুবক হাত জোড় করে মিনতি করে বললে, দয়া করুন, একটিবার দেখতে দিন।

সুন্দরবাবু নাচারভাবে বললেন, আপনি তো ভারি ছিনেজোঁক দেখছি। বেশ চলুন; নয়ন সার্থক করুন।

মৃতদেহের ওপরে অর্ধ মিনিট কাল চক্ষু বুলিয়েই যুবক চিৎকার করে কেঁদে উঠল।

সুন্দরবাবু বিস্মিত কণ্ঠে বললেন, আরে গেল, খামোখা কান্নাকাটি কেন?

–এই তো আমার ভাই নন্দলালের দেহ! যা ভেবেছি তাই, আমাদের সর্বনাশ হয়েছে!

–আরে আপনি পাগল না কী!

–আমি পাগল নই মশাই, পাগল নই! বিশ্বাস না হয়, ওর কাপড় তুলে দেখুন, জানুর ওপরে দুই ইঞ্চি লম্বা কালো জড়ুলের দাগ আছে।

অবিশ্বাস ভরে সুন্দরবাবু এগিয়ে গেলেন! কাপড় সরানো হল। জানুর ওপরে সত্য সত্যই রয়েছে দুই ইঞ্চি লম্বা কালো জড়ুল-চিহ্ন।

ধাঁ করে তার মাথায় জাগল একটা নতুন সন্দেহ। আগ্রহের সঙ্গে তিনি শুধোলেন, আপনার ভাইয়ের নাম নন্দলাল?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

নন্দলাল মিত্র?

–আজ্ঞে হ্যাঁ।

বাড়ি পাঁচ নম্বর রায় রোডে?

হ্যাঁ।

–তার এক বিশেষ বন্ধুর নাম মণিমোহন বসু।

–হুঁ।

সুন্দরবাবু টুপি খুলে নিজের টাক চুলকোতে-চুলকোতে হতভম্বের মতো বললেন, এ কি কাণ্ড রে বাবা! এটা খুনের মামলা, না হেঁয়ালির মামলা?

.

চন্দ্রনাথ রায়

প্রভাতী চায়ের আসরের জন্যে দুজন প্রস্তুত হচ্ছে, এমন সময়ে হন্তদন্তের মতো সুন্দরবাবুর প্রবেশ

জয়ন্ত শুধোলে, এ কী সুন্দরবাবু, হাঁফাচ্ছেন কেন?

–দৌড়ে দৌড়ে আসছি যে!

–দৌড়ে দৌড়ে?

–প্রায়! পাছে চা-পানের মাহেন্দ্রক্ষণটি উতরে না যায়, সেই ভয়ে সবেগে পদচালনা করছিলুম! গেল তিন দিন তোমাদের সঙ্গে দেখা হয়নি, ভয় হল আসর থেকে বুঝি নাম কাটা যায়!

–তাহলে গেল তিন দিন বাড়িতে বসে চা-পান করেছেন?

–পাগল! আমার বাড়ির চা ছুঁই না। সে যেন নালতের মতো, আর দোকানের চা ও খাই না, সে যেন ঘোলাটে গঙ্গাজল! আজ তিন দিন চা খাওয়াই হয়নি।

–ব্যাপার কী?

–গড়ের মাঠের সেই হত্যাকাণ্ডের ঠেলা। হন্তদন্তের মতো খালি তদন্ত আর তদন্ত করতে হচ্ছে। সূত্রও পেয়েছি ঢের, কিন্তু সব সূত্র জোট পাকিয়ে গিয়েছে।

–আচ্ছা, আগে চেয়ারাসীন হোন, উদরদেশের দুর্ভিক্ষ নিবারণ করুন। তারপর সব কথা শুনব।

সুন্দরবাবু আসন গ্রহণ করে বললেন, আজ চায়ের সঙ্গে নতুন কোনও বিশেষত্ব আছে না কি?

বিশেষ কিছুই নয়। আমেরিকান ব্রেকফাস্ট বিস্কুট, টোম্যাটো-ওমলেট আর কড়াইশুটির কচুরি।

–ব্যস, ব্যস! ওইতেই আমি খুশি হতে পারব। সত্যি বলতে কি ভায়া বাড়ির চা আর ভালো লাগে না কেন জানো? তোমাদের বউদিটি দ্রৌপদী নন, নতুন পুরাতন যে-কোনও রন্ধনে তিনি একেবারে মুর্তিমতী নিরাশা! হুম, কথায় বলে চা-টা! চায়ের সঙ্গে কিছু কিছু টা না থাকলে চা কখনও সুখের হয়!

মানিক বললে, সুন্দরবাবু, আমাদের বউদি দ্রৌপদী হলে আপনি কি তাকে সহ্য করতে পারতেন?

-মানে?

–দ্রৌপদীর ছিল পাঁচজন স্বামী।

–ধেৎ, খালি কথার ছল ধরা। আচ্ছা, জয়ন্ত, টোম্যাটো-ওমলেট পদার্থটা কী?

–ওমলেটের ভিতর মাখনে ভাজা কুচি কুচি পেঁয়াজ আর টোম্যাটো পুর। খুব সহজ

কিন্তু খেতে মজা তো? নাম শুনেই জিভে জল আসছে। কোথায় হে শ্রীমধুসূদন, শীঘ্র দেখা দাও।

ট্রে হাতে মধু ভৃত্যের প্রবেশ। চা-পর্ব শেষ হবার আগে সুন্দরবাবু আর বাক্যালাপ করবার চেষ্টা করলেন না।

জয়ন্ত বললে, অতঃপর।

সুন্দরবাবু বললেন, তোমরা মর্গের ব্যাপারটা তো আগেই শুনেছ। বেশ, তারপর থেকেই আরম্ভ করি। শালিখার চন্দ্রনাথ রায়ের সন্ধানে গিয়েছিলাম। কিন্তু তার বাসা খালি, বাহির

থেকে তালাবন্ধ। খবর নিয়ে জানলুম হত্যাকাণ্ডের দিন বৈকালে একখানা কালো রঙের বুইক সিডান গাড়িতে চড়ে সে চলে গিয়েছে।

–গাড়িখানা তার নিজের?

হ্যাঁ। গাড়ি চালাত নিজেই।

বাসায় কি সে একলা থাকত?

–হ্যাঁ। অর্থাৎ চাকর-বামুন-দারোয়ান নিয়ে একলা। কিন্তু তার সঙ্গে আর সকলেও অদৃশ্য হয়েছে। এইটেই সন্দেহজনক।

জয়ন্ত খানিকক্ষণ চুপ করে রইল। ধীরে ধীরে বললে, অসাধারণ মামলা বটে! মহেন্দ্রবাবু লাশ দেখে বলছেন সেটা তাঁর পুত্র মণিমোহনের মৃতদেহ। আর একজন বলছে, সে দেহটা হচ্ছে তার দাদা নন্দলালের। দ্বিতীয় ব্যক্তির কথা মতো লাশের জানুর কাপড় তুলে দেখা গিয়েছে দুই ইঞ্চি লম্বা কালো জড়ুলের দাগ। মনে হচ্ছে দ্বিতীয় ব্যক্তির কথাই ঠিক! কারণ লাশের মুখ নেই–মহেন্দ্রবাবুর ভ্রম হওয়া অসম্ভব নয়।

সুন্দরবাবু বললেন, শুনলুম মণিমোহনের আর নন্দলালের দেহের রং উচ্চতা আর গড়ন পিটন নাকি প্রায় একইরকম!

–এখানে প্রশ্ন ওঠে অনেকগুলো। ধরলুম হত ব্যক্তি হচ্ছে নন্দলাল! তাহলে হত্যাকারী কে? মণিমোহন? কিন্তু মহেন্দ্রের মুখে প্রকাশ, নন্দ ছিল তার সবচেয়ে বড় বন্ধু। সে অমন বন্ধুকে হত্যা করবে কেন? ঘটনাস্থলে আর এক ব্যক্তির পদচিহ্ন পাওয়া গিয়েছে। সেই-ই বা কে? শালিখার চন্দ্রনাথ? সে এখানে কোন ভূমিকায় অভিনয় করেছে? নিশ্চয়ই মহাত্মার ভূমিকায় নয়, কারণ সে-ও গা-ঢাকা দিয়েছে। হা, ভালো কথা। যে তিনজন লোকের পায়ের দাগ পাওয়া গিয়েছে, তার প্লাস্টারের চাঁদ তোলা হয়েছে?

–হয়েছে।

তারপর?

–একজোড়া ছাপের সঙ্গে হত ব্যক্তির–অর্থাৎ নন্দের জুতো অবিকল খাপ খেয়ে গিয়েছে। মণিমোহনের বাসা থেকে জুতোও সংগ্রহ করেছি। তার জুতোও মিলে গিয়েছে আর এক জোড়া ছাপের সঙ্গে। কিন্তু তৃতীয় ব্যক্তিকে পাইনি, তাই ছাপের সঙ্গে তার জুতোও মেলানো হয়নি।

কিন্তু আপনি আরও কিছুদূর অগ্রসর হতে পেরেছেন। পদ চিহ্নের ছাপ বিশেষভাবে প্রমাণিত করেছে দুটো সত্য। প্রথমত, ঘটনাস্থলে মণিমোহনের উপস্থিতি। দ্বিতীয়ত, হত ব্যক্তি নন্দ ছাড়া আর কেউ নয়। মামলাটা অনেকখানি হালকা হয়ে এল নাকি?

সুন্দরবাবু বললেন, কিন্তু মামলাটার আর-এক দিক আরও ভারী হয়ে উঠছে।

কীরকম?

–বলেছি তো, নন্দ ছিল কে সরকারের বিখ্যাত জুয়েলারি ফার্মের ক্যাশিয়ার। সেখানে এক নতুন কাণ্ড হয়ে গিয়েছে।

বুঝেছি। চুরি।

সুন্দরবাবু সবিস্ময়ে বললেন, কেমন করে বুঝলে?

জয়ন্ত রুপোর ডিবে বার করে এক টিপ নস্য গ্রহণ করলে। মানিক কৌতূহলী চোখে তার দিকে তাকাল। সে জানে, এই নস্য গ্রহণটা হচ্ছে তার বন্ধুর বিশেষ আনন্দের লক্ষণ।

সুন্দরবাবু আবার বললেন, কেমন করে বুঝলে তুমি?

জয়ন্ত হাসতে-হাসতে বললে, এটা আমার আন্দাজ মাত্র।

বা রে, এমন যুক্তিহীন আন্দাজের কোনও কারণ নেই!

কারণ আছে বইকী। আমার আন্দাজ মোটেই যুক্তিহীন নয়। লোকে অকারণে নরহত্যা করে না। কিন্তু গোড়া থেকেই এই হত্যাকাণ্ডের মধ্যে আমি উদ্দেশ্য খুঁজে পাচ্ছিলাম না। এখন বেশ বোঝা যাচ্ছে যে, নন্দ মারা পড়েছে ওই টাকার জন্যেই। যদিও হত ব্যক্তি বিখ্যাত এক জুয়েলারি ফার্মের ক্যাশিয়ার শুনে একটা সন্দেহ আমার মনে উঁকি মারছিল! এখন জানা গেল, আমার সন্দেহ অমূলক নয়। সুন্দরবাবু, আন্দাজে আমি আরও একটা কথা বলতে পারি।

–পারো নাকি? বলে ফ্যালো।

–কে সরকারের ফার্ম থেকে মোটারকম চুরি হয়ে গিয়েছে, আর চুরির জন্যে দায়ী ওই হত নন্দলাল।

সুন্দরবাবু বিস্ফারিত চক্ষে তালে-তালে তিনবার তালি দিয়ে বললেন, ঠিক! ঠিক! বা রে আন্দাজ! বা রে জয়ন্ত!

জয়ন্ত বললে, এখন আসল ব্যাপারটা খুলে বলুন দেখি! কে সরকার নিজে থানায় অভিযোগ করে এসেছিল?

–কিসের অভিযোগ?

–চুরি বলেই ধরে নাও! চুরিটা হয়েছে হত্যাকাণ্ডের দিনেই। কে সরকারের বসতবাড়ি আর দোকান এক জায়গায় নয়। তার দোকান বন্ধ হত সন্ধ্যার মুখে। সেদিন দোকান বন্ধ হবার আগেই জরুরি কাজের জন্য তাকে বাড়িতে ফিরতে হয়েছিল। কথা ছিল, দোকানের ক্যাশ নিয়ে দোকান বন্ধ করে নন্দ তাঁর বাড়িতে জমা দিয়ে আসবে। কিন্তু নন্দ সেদিন ক্যাশ নিয়ে দোকান থেকে বেরিয়েই একেবারে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে।

টাকার পরিমাণ কত?

–তেরো হাজার পাঁচশো পঞ্চাশ।

নন্দের সম্বন্ধে কে সরকারের ধারণা কী?

–অত্যন্ত উচ্চ। বললে, নন্দ অতিশয় বিশ্বাসী আর সৎচরিত্র। তার দ্বারা কোনওরকম অসৎ কাজ হওয়া অসম্ভব।

–ঠিক। আমারও ওই বিশ্বাস।

জয়ন্ত, আরও একটা এমন ব্যাপার জানা গিয়েছে, যা তুমি কিছুতেই আন্দাজ করতে পারবে না।

–পদে-পদে আন্দাজে ঢিল ছোঁড়ার অভ্যাস আমার নেই।

লাশের পরনে যে গেঞ্জি আর কাপড় ছিল তা নন্দের নয়, মণিমোহনের।

–শুনে বিস্মিত হলুম না। নন্দের পরনে কোট বা অন্য কোনওরকম জামাও ছিল না, অপরাধীরা তা খুলে নিয়ে গিয়েছে, প্রথমদিনেই আন্দাজে এ কথাটা আপনাকে বলেছিলুম। সুন্দরবাবু, দোকান থেকে নন্দ সেদিন বাসায় ফিরে এসেছিল?

হ্যাঁ, তার বাসা দোকান থেকে কে সরকারের বাড়িতে যাবার পথেই পড়ে। বাসায় এসে হাত-মুখ ধুয়ে কিছু খাবার খেয়ে আবার সে বেরিয়ে যায়–

–হ্যাঁ, মালিকের বাড়িতে টাকাগুলো পৌঁছে দেবার জন্যে। তার পরের ঘটনাগুলোও আমি কিছু কিছু আন্দাজ করতে পারছি।

–হুম, আবার আন্দাজ!

নন্দ পথ দিয়ে যাচ্ছে, হঠাৎ মণিমোহনের সঙ্গে দেখা। আমার বিশ্বাস, সে ছিল শালিখার চন্দ্রনাথের কালো রঙের বুইক-সিডান গাড়িতে, আর গাড়ি চালাচ্ছিল চন্দ্রনাথ নিজেই।

মণিমোহনের আহ্বানে নন্দ গাড়িতে এসে ওঠে। নন্দের কাছে কত টাকা আছে প্রকাশ পায়। তারপরের ব্যাপারগুলো ঠিক আন্দাজ করতে পারছি না। নন্দ গাড়িতে ওঠে সন্ধ্যার সময়ে, কিন্তু মারা পড়ে অন্তত রাত দুটোর পরে! মাঝের কয়েক ঘণ্টার হিসাব হত্যাকারী ধরা না পড়লে জানা যাবে না! নন্দকে হত্যা করে চন্দ্রনাথ আর মণিমোহন। আমার বিশ্বাস আসল। হতাকারী হচ্ছে চন্দ্রনাথই, মণিমোহন বোধহয় স্বহস্তে বন্ধু-হত্যা করেনি। তারপর মৃতদেহের জামাকাপড় খুলে পরিয়ে দেওয়া হল মণিমোহনের জামাকাপড়। লাশের মুখ নিশ্চিহ্ন, তার দৈর্ঘ্য, রং আর গড়নপিটন প্রায় মণিমোহনের মতোই, তার পরনেও রইল মণিমোহনের জামাকাপড়। সুতরাং সেটা মণিমোহনের দেহ বলেই শনাক্ত হওয়া স্বাভাবিক, সকলে বুঝবে, কোনও অজানা। ব্যক্তি অজানা কারণে মণিমোহনকে হত্যা করেছে। ওদিকে পুলিশ ভাবত নন্দ জুয়েলারি ফার্মের টাকা চুরি করে পলাতক হয়েছে। অপরাধীরা খুব মাথা খেলিয়ে প্ল্যান তৈরি করেছিল বটে, কিন্তু সব ব্যর্থ করে দিলে তুচ্ছ একটা জড়ুল আর কতগুলো পায়ের দাগ। সুন্দরবাবু এইবার

আপনার মামলাটা পরিষ্কার হয়ে গেল তো?

সুন্দরবাবু বললেন, তা তো গেল দেখছি। কিন্তু জয়ন্ত বাধা দিয়ে বলল, কিন্তু আমার আর একটা আন্দাজ, এই কাজ হাসিলের পর চন্দ্রনাথ হয়তো মণিমোহনকেও হত্যা করেছে।

হুম, আন্দাজেই তুমি কেল্লা ফতে করবে দেখছি। এখন চন্দ্রনাথকে হস্তগত করবার উপায়টাও আন্দাজে বাতলে দিতে পারো?

এমন সময় মধু ঘরে ঢুকে বললে, শালখে থেকে একটি বাবু দেখা করতে এসেছেন।

জয়ন্ত সচমকে বললে, শালখে থেকে? নাম বলেছে?

আজ্ঞে হ্যাঁ। চন্দ্রনাথ রায়।

সুন্দরবাবু বাঘের মতো লাফিয়ে দাঁড়িয়ে বললেন, হুম!

.

অভিনেতা চন্দ্রনাথ

সত্য-সত্যই কল্পনাতীত। পলাতক আসামি চন্দ্রনাথ নিজেই দেখা করতে এসেছে তাদের সঙ্গে। মামলাটার গোড়াতেই কোনও গলদ নেই তো? অবাক হয়ে ভাবতে লাগল জয়ন্ত ও মানিক।

সুন্দরবাবু খুশি-ভরা গলায় বললেন, আমাদের ভাগ্য ভালো। শিকার নিজেই জালে পড়তে চায়।

জয়ন্ত বললে, সুন্দরবাবু এখন চন্দ্রনাথকে নিয়ে কী করবেন?

–আগে করব গোটা কয় প্রশ্ন। তারপর তাকে থানায় নিয়ে গিয়ে ঘটনাস্থলে পাওয়া তৃতীয় ব্যক্তির পদচিহ্নের সঙ্গে তার জুতো মিলিয়ে দেখব।

জয়ন্ত বললে, মধু, বাবুকে এখানে নিয়ে এসো। মধুর প্রস্থান।

অনতিবিলম্বেই ঘরের ভিতরে চন্দ্রনাথের আবির্ভাব।

সুন্দরবাবু লক্ষ করে দেখলেন মণিমোহনের পিতার বর্ণনার সঙ্গে তার চেহারা মিলে। যায় অবিকল। প্রায় ছয় ফুট লম্বা বলিষ্ঠ ও ঘোর কৃষ্ণবর্ণ দেহ। নাক খাদা, কুকুতে চোখে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। মুখে গোফদাঁড়ি নেই। পরনে প্যান্ট-কোট, হাতে বেজায় মোটা লাঠি। বাঁ-হাতে আধখানা কাটা কড়ে আঙুল।

দিব্যি নিশ্চিন্তভাবে ও সপ্রতিভ মুখে ঘরে ঢুকেই চন্দ্রনাথ বললে, আমি সুন্দরবাবুর সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।

–আমার সঙ্গে? কিন্তু এখানে কেন? এটা কি আমার ডেরা?

–মোটেই নয়, মোটেই নয়। কে না জানে বাঘ থাকে বনে, আর পুলিশ থাকে থানায়? আমি থানাতেও ধরণা দিয়েছিলুম। সেখান থেকেই পেয়েছি এখানকার ঠিকানা।

লোকটার প্রগলভতা দেখে সুন্দরবাবুর মনে ক্রোধের সঞ্চার হল। কিন্তু সে ভাব দমন করে তিনি শুধোলেন, আপনার নাম চন্দ্রনাথ রায়?

–তাই তো আমি জানি, লোকেও আমাকে ওই বলেই ডাকে বটে।

তার কথাবার্তার ধরন-ধারণ বাড়িয়ে তুললে সুন্দরবাবুর ক্রোধের মাত্রা। বেশ একটু ঝাঝালো গলায় বললেন, মহাশয়ের পিতৃদেব কি অন্ধ ছিলেন?

উঁহুঁ।

–তবে মশাইকে কি স্বচক্ষে দেখে তিনি আপনার নাম রাখেননি?

চন্দ্রনাথ নীরসকণ্ঠে হেসে উঠল-হা-হা-হা-হ্যাঁ। বললে, ঠিক কথা। আমার গায়ের রংটা চাঁদের মতো নয় বটে! হাঁ, বাবার যে ভ্রম হয়েছিল সে কথা অস্বীকার করা চলে না। কিন্তু কী করব বলুন, পিতা হচ্ছেন দেবতাস্থানীয়, পুত্র হয়ে তার ভ্রম আর শোধরাবার চেষ্টা করিনি।

–বেশ, তাহলে বাপের সুপুত্রের মতো ওই চেয়ারখানার ওপরে একটু বসুন দেখি, আমি গোটাকয় প্রশ্ন করতে চাই।

চেয়ারখানা হড়-হড় করে সুন্দরবাবুর খুব কাছে টেনে নিয়ে গিয়ে চন্দ্রনাথ বসে পড়ল। তারপর মোটা লাঠিগাছা পদযুগলের মাঝখানে রেখে তার ওপরে দুই হস্ত স্থাপন করে বললে, আপনার প্রশ্নগুলো শ্রবণ করবার জন্যে আমার দুই কর্ণ অতিশয় ব্যগ্র হয়ে উঠেছে।

এ কীরকম ঢ্যাঁটা অপরাধী, পুলিশ দেখে দূরে সরে দাঁড়ানো দূরের কথা, পুলিশের গা ঘেঁষে বসতে ভয় পায় না। ভালো কথা নয় তো, যা দিনকাল পড়েছে, সাবধানের মার নেই। সুন্দরবাবু নিজেই তফাতে সরে গিয়ে দখল করলেন অন্য একখানা চেয়ার।

চন্দ্রনাথ হাসতে লাগল মুখ টিপে টিপে।

সুন্দরবাবু বললেন, হঠাৎ আমার সঙ্গে আপনার দেখা করবার শখ হল কেন?

–শুনলুম, সেদিন আমার বাড়িতে আপনি বেড়াতে গিয়েছিলেন!

–বেড়াতে নয়, আপনাকে খুঁজতে।

–বেশ তাই! কিন্তু কেন?

নন্দলাল মিত্র খুন হয়েছে জানেন?

–কে নন্দলাল?

–একেবারে আকাশ থেকে পড়লেন যে। মণিমোহন বসুর বিশেষ বন্ধু নন্দলালকে চেনেন নাকি?

–না, আমি কেবল মণিমোহনকেই জানি।

–বটে। গেল পঁচিশ তারিখে মণিমোহনের সঙ্গে আপনার দেখা হয়নি?

না।

ওই তারিখে আপনি কোথায় ছিলেন?

–সন্ধ্যা পর্যন্ত বাসাতেই ছিলুম। তারপর হঠাৎ এক আত্মীয়ের মারাত্মক অসুখের খবর পেয়ে তাড়াতাড়ি দেশে চলে যেতে হয়।

–চাকর-বামুন-দারোয়ান সবাইকে নিয়ে?

নিশ্চয়ই! একলা মানুষ, আমাকে দেখবে কে?

আপনার দেশ কোথায়?

–এখান থেকে চল্লিশ মাইল দুরে ভজনপুর গ্রামে।

আপনার সট গান আছে?

আছে! অন্যরকম বন্দুকও আছে।

–মণিমোহন আপনার বন্ধু?

–হ্যাঁ। নতুন বন্ধু।

–তাকে আপনি একখানা চিঠি লিখেছিলেন, পঁচিশ তারিখে আপনার সঙ্গে দেখা করবার জন্যে?

হ্যাঁ।

–সে আপনার সঙ্গে দেখা করেছিল?

না।

–ওই তারিখের পর তার সঙ্গে আপনার আর দেখা হয়েছে?

না।

–সে এখন কোথায় আছে?

জানি না।

তার আর কোথায়-কোথায় আসা-যাওয়া আছে?

ভগবান জানেন।

ঘটনাস্থলে তিনজন লোকের পদচিহ্ন পাওয়া গেছে। মণিমোহনের আর নন্দলালের। কিন্তু তৃতীয় পদচিহ্নের অধিকারী কে, তা আমরা আবিষ্কার করতে পারিনি।

শুনে দুঃখিত হলুম।

–আপনার দুঃখ নিয়ে আপনি চুলোয় গেলেও আমি দুঃখিত হব না! হুম! আমি এখন ভাবছি, কে এই তৃতীয় ব্যক্তি?

–বলতে পারব না, আমি গনকার নই।

–আরে গেল, এ-প্রশ্ন কি আপনাকে করছি? আমি কথা কইছি নিজের সঙ্গেই। নিজের মনের ভিতরেই আমি উত্তর খোঁজবার চেষ্টা করছি।

–চেষ্টা করুন। আপনার আর কোনও প্রশ্ন আছে?

–আপাতত নাই।

–তাহলে আমি গাত্রোত্থান করতে পারি?

নিশ্চয়ই! এইবারে আপনাকে গাত্রোত্থান করতে হবেই।

তবে এই গাত্রোত্থান করলুম।

সুন্দরবাবুও আসন ত্যাগ করে বললেন, এইবারে আপনাকে আমার সঙ্গে যাত্রা করতে হবে।

–কোথায়?

–থানায়।

চন্দ্রনাথ সভয়ে বলে উঠল, থানায় কেন?

যথাসময়েই সেটা জানতে পারবেন!

–আপনার সব কথারই জবাব তো দিলুম। আবার আমাকে থানায় টেনে নিয়ে যাবার কারণ কী?

কারণ? জলখাবার খাওয়াবার জন্যে নয়! ধরুন অকারণেই।

এতক্ষণ পরে চন্দ্রনাথ যেন হারিয়ে ফেলল নিজের সমস্ত দৃঢ়তা ও নিশ্চিন্ত। কাতর কণ্ঠে বললে, অকারণে আমাকে থানায় নিয়ে গিয়ে লাভ কী সুন্দরবাবু?

সুন্দরবাবু নিজের বাহু বিস্তার করে সবলে ধারণ করলেন চন্দ্রনাথের দক্ষিণ বাহুঁ। তারপরে বললেন, হুম! এখন সুড়সুড় করে আমার সঙ্গে চলুন তো। পরে ভাবা যাবে লাভ-লোকসানের কথা। আসি জয়ন্ত, আসি মানিক। খানিক পরেই ফোনে তোমাদের সঙ্গে বাক্যালাপ করব। আসুন, অমাবস্যার দৃশ্যমান চন্দ্র।

চন্দ্রনাথ কলের পুতুলের মতো চলে গেল সুন্দরবাবুর সঙ্গে।

জয়ন্ত চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললে, মানিক, এইবারে আমরা মতামত বিনিময় করি এসো। চন্দ্রনাথ লোকটাকে তোমার কেমন লাগল?

ভালো লাগল না।

–ঠিক। একেবারে পয়লা নম্বরের অপরাধীর চেহারা! আর একটা ব্যাপার লক্ষ করেছ?

কী।

চন্দ্রনাথ যতক্ষণ এখানে ছিল, একবারও সোজাসুজি তোমার আর আমার দিকে তাকায়নি। অথচ সে ছিল আমাদের সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন। কারণ মাঝে মাঝে ওই বড় আয়নাখানার দিকে আড়চোখে চেয়ে দেখে নিচ্ছিল আমাদের।

–কিন্তু সে এখানে এসেছিল কেন?

–অভিনয় করতে।

অভিনয় করতে?

–হ্যাঁ। আর সেই সঙ্গে নিজেকে নিরপরাধ বলে প্রমাণিত করতে।

কিন্তু এ ভয়ও তো তার থাকা স্বাভাবিক যে ঘটনাস্থলে পাওয়া তৃতীয় ব্যক্তির পদচিহ্নের সঙ্গে তার নিজের পদচিহ্নও মিলে যেতে পারে?

তা পারে! এইখানেই আমার কেমন খটকা লাগছে। এমন সম্ভাবনার কথা যে তারও মাথায় জাগেনি, তাকে তো দেখে এতটা নির্বোধ বলে মনে হল না! সুন্দরবাবু তো ওই জন্যেই তাকে থানায় ধরে নিয়ে গেলেন।

–আর থানায় যাবার নামেই সে ভয়ে কীরকম জড়োসড়ো হয়ে পড়ল, লক্ষ করেছ তো?

–তা আবার করিনি? কিন্তু তা হচ্ছে অভিনয়, অভিনয়, অভিনয়। আসলে সে একটুকুও ভয় পায়নি।

কেমন করে জানলে?

–এখানে আসবার আগে সে নিজেই সুন্দরবাবুর খোঁজে থানায় গিয়ে হাজির হয়েছিল। সুতরাং থানায় যাবার নামে তার ভয় পাবার কোনওই কারণ থাকতে পারে না। সে ভয় পায়নি, ভয়ের অভিনয় করছিল।

–কেন?

–বোধহয়, সুন্দরবাবুকে সে একেবারে অপদস্থ করতে চায়। আমার মনে হয়, সে ভালো করেই জানে যে, থানায় গিয়ে সুন্দরবাবু তার পদচিহ্ন পরীক্ষা করবেন।

বল কী হে?

হ্যাঁ। শেষ পর্যন্ত কী দাঁড়াবে জানো? ঘটনাস্থলের পদচিহ্নের সঙ্গে মিলবে না তার পদচিহ্ন। পুলিশ বনবে বোকা। সে হবে সমস্ত সন্দেহ থেকে মুক্ত। নিশ্চয় এই উদ্দেশ্য নিয়েই সে আজ সুন্দরবাবুর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল। নইলে তার এই অভাবিত আবির্ভাবের কোনও অর্থই হয় না, যাকগে ও-সব কথা। সুন্দরবাবু তো এখনও ফোন করলেন না দেখছি। আপাতত আমরা কী করি বলো তো? দু-এক চাল দাবা বোড়ে খেলবে নাকি?

–আপত্তি নেই।

চলল খেলা। চল্লিশ মিনিট পরে প্রথম চাল খেলা শেষ হল। আর এক চালের জন্যে। তারা খুঁটি সাজাচ্ছে, এমন সময়ে বেজে উঠল টেলিফোন।

রিসিভারটা তুলে নিয়ে জয়ন্ত বললে, হ্যালো?

–আমি সুন্দরবাবু।

–খবর কী?

হুম, সব গুলিয়ে গেল।

তা তো যাবেই।

–মানে?

–মানে চন্দ্রনাথের পদচিহ্ন পরীক্ষার ফল সন্তোষজনক হয়নি।

–কেমন করে জানলে?

–খুব সহজে। দুইয়ে-দুইয়ে যোগ দিয়ে দেখলুম, চার হল।

–ধেৎ, হেঁয়ালি ভালো লাগে না! দস্তুরমতো অপদস্থ হয়েছি।

ব্যাপারখানা কী?

–ঘটনাস্থলে তৃতীয় ব্যক্তির যে জুতোর ছাপ পাওয়া গিয়েছে, চন্দ্রনাথের জুতোর ছাপের চেয়ে তা বড়। চন্দুরে রাসকেলটা আমার মুখের ওপরে কলা দেখিয়ে হাড় জ্বালানো হাসি হাসতে-হাসতে চলে গেল।

–এটুকু তো তিন-চার মিনিটের ব্যাপার। আমাকে ফোন করতে আপনার এত দেরি হল কেন?

–হঠাৎ আরও দুটো খবর পেলুম। দ্বিতীয় খবরটা বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য।

–যথা

–আমার সহকারী সুনীলকে নন্দলালের পাড়ায় তদন্ত করতে পাঠিয়েছিলুম। সে জানালে, ও-পাড়ার এক মণিহারি দোকানের মালিক হত্যাকাণ্ডের দিন সন্ধ্যাবেলায় দেখেছিল, নন্দ পথ। দিয়ে যাচ্ছে, এমন সময়ে একখানা মোটরগাড়ি তার কাছে এসে থামে। গাড়ির ভিতর থেকে মণিমোহন মুখ বাড়িয়ে নন্দকে ডাকে। নন্দ গাড়িতে ওঠে, গাড়িখানা চলে যায়।

সুন্দরবাবু, আমার আন্দাজের সঙ্গে অনেকটা মিলছে না?

–তা মিলছে।

তারপর?

–গাড়ির ভিতর দুইজন লোক ছিল, মণিমোহন আর চালক। দোকানি কিন্তু চালকের দিকে নজর দেয়নি, তাকে শনাক্ত করতে পারবে না।

কালো রঙের বুইক-সিডান গাড়ি?

–দোকানি বললে, কালো রঙের সিডান গাড়ি বটে, কিন্তু বুইক, কি ফোর্ড, কি অস্টিন, তা বোঝবার মতো জ্ঞান তার নেই।

–গাড়ির নম্বর?

–দোকানি দেখেনি।

সুন্দরবাবু, এ খবরে এইটুকু জানা গেল, আমার অনুমান নিতান্ত মিথ্যা নয়। এর ওপর নির্ভর করে আমরা চন্দ্রনাথের কিছুই করতে পারব না, কিন্তু ধাবমান হতে পারব মণিমোহনের পিছনে।

–আরও একটা উপায় হয়েছে।

কীরকম?

–দ্বিতীয় খবরটা শুনলেই বুঝতে পারবে। আমাদের এক চর এসে খবর দিলে, খিদিরপুর ছাড়িয়ে গঙ্গার ধারে একখানা বাগানবাড়ির ভিতরে স্বচক্ষে সে মণিমোহনকে প্রবেশ করতে দেখেছে।

কবে?

–আজই ভোরবেলায়।

–এখন কী করতে চান?

বাড়িটাকে চারদিকে থেকে পাহারা দেবার জন্য জনকয় লোক পাঠিয়েছি। আমি সদলবলে যাত্রা করার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছি। তোমরাও আসছ তো?

–সে কথা আবার বলতে।

.

ভদ্রেশ্বর ভদ্র

খিদিরপুর। গঙ্গার ধার। বেলা প্রায় বারোটা, কিন্তু সূর্যকে ঢাকা দিয়ে রেখেছে মেঘলা আকাশ। মাঝে-মাঝে পৃথিবীকে ধুয়ে দিয়ে যাচ্ছে দু-এক পশলা বৃষ্টি।

সদলবলে সুন্দবাবু একখানি বাগানবাড়ির সামনে এসে দাঁড়ালেন। পিছনে জয়ন্ত ও মানিক।

পাঁচিল ঘেরা প্রকাণ্ড এক বাগানের মাঝখানে সেকেলে বাড়ি। সেকেলে বাড়ি বটে, কিন্তু নিয়মিত সংস্কারের গুণে এখনও অব্যবহার্য হয়ে পড়েনি। বাগানের অংশটা নামেই বাগান, কোথাও ফুলগাছের কোনও চিহ্নও নেই। মধুলোভী মৌমাছি আর প্রজাপতিরা সেখানে উড়ে আসে বটে, কিন্তু হতাশ হয়ে আবার উড়ে পালায়। এখানে-ওখানে দাঁড়িয়ে আছে মোটা মোটা গুঁড়িওয়ালা বুড়ো-বুড়ো গাছ–আম, কাঁঠাল, জাম, জামরুল, তাল, নারিকেল প্রভৃতি। আর আছে। অগুনতি কলাগাছের ভিড়। আর শাকসবজির ছোট-বড় খেত।

মানিক বললে, বাগানের মালিক যে শৌখিন নন, ফুলগাছের অভাবই তা প্রমাণিত করছে। কিন্তু তিনি যে আমাদের সুন্দরবাবুর মতোই উদরপরায়ণ তাতে আর একটুও সন্দেহ নেই।

সুন্দরবাবু দুই চক্ষে ফুটল বিস্ফোরণের লক্ষণ। গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, একটুও সন্দেহ না থাকার কারণ?

–এখানে ফুলগাছ নেই, খালি ফলগাছ। এখানে শাক-সবজির খেতে তেমন সুগন্ধ না থাকতে পারে, রন্ধনশালার মাল-মশলা আছে যথেষ্ট। আপনি কি রন্ধনশালাকে দুনিয়ার সবচেয়ে ভালো জায়গা বলে মনে করেন না!

সুন্দরবাবু বললেন, আমি তোমার প্রশ্নের উত্তর দিতে চাই না। ওই যে জগন্নাথ আসছে। আমি এখন ওর সঙ্গেই কথা কইতে চাই।

জয়ন্ত শুধোলে, জগন্নাথ কে?

আমাদের চর। সেই-ই তো মণিমোহনকে এই বাড়িতে ঢুকতে দেখেছে। জগন্নাথ কাছে এসে নমস্কার করে বললে, বড়বাবু, মণিমোহন এখনও ওই বাড়ির ভিতরেই আছে।

সুন্দরবাবু বললে, দ্যাখো জগন্নাথ, আজ সকালেই এক বেটা চন্দুরে আমাকে যে ঠকানটা ঠকিয়ে গিয়েছে তা আর বলবার নয়। একদিনে আমি দু-দুবার ঠকতে চাই না। তুমি মণিমোহনকে ঠিক দেখেছ তো?

–আজ্ঞে মণিমোহনকে আগে আমি অনেকবার দেখেছি, তার চেহারা কি ভুলতে পারি? তবে আগে তাকে কোনওদিন কোট পরতে দেখিনি, আজ সে কোট পরে আছে।

–হুম! পুলিশের চোখে ধোঁকা দেবার চেষ্টা আর কি? আরে বাবা, এত সহজে কি পুলিশকে ফাঁকি দেওয়া যায়?

মানিক বললে, বিশেষ করে আমাদের সুন্দরবাবুকে!

সে কথা সুন্দরবাবু গায়ে মাখলেন না।

হঠাৎ জগন্নাথ চমকে চাপা-গলায় বলে উঠল, বড়বাবু, বড়বাবু, ওই দেখুন মণিমোহনকে। আমাদের দিকেই আসছে!

সুন্দরবাবু তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন, সবাই গাছ কিম্বা ঝোপের আড়ালে গা ঢাকা দাও। এত সহজে কেল্লা ফতে! বরাত ভালো!

মণিমোহন নতমুখে অসঙ্কোচে এগিয়ে এল, কোনও সন্দেহ করতে পারলে না। উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, একহারা কিন্তু বলিষ্ঠ দেহ। মুখশ্রীও মন্দ নয়।

হঠাৎ চারদিক থেকে পুলিশের দল তাকে ঘিরে ফেলল। ভ্যাবাচাকা খেয়ে সে দাঁড়িয়ে পড়ল।

সুন্দরবাবু বললেন, বাবাজি, এখন ভিজে বেড়ালের মতো আমাদের সঙ্গে সুড়সুড় করে আসবে কি?

–কোথায়?

–আমাদের পোশাক দেখে বুঝতে পারছ না, আমরা তোমাকে কোথায় নিয়ে যেতে চাই?

–আপনারা তো পুলিশ।

–আর তুমি তো মণিমোহন বসু?

–আজ্ঞে না, এ-নাম আমি জীবনে শুনিনি।

জগন্নাথ এগিয়ে এসে বললে, না, তুমিই মণিমোহন। তোমাকে আমি খুব চিনি।

আমার নাম ভদ্রেশ্বর ভদ্র।

–হুম্! আবার নাম ভাড়ানো হয়েছে? কিন্তু ও-পাঁচটা খুবই পুরোনো, ধোপে টাকে । ভদ্রেশ্বর ভদ্র! কোনও আধুনিক ভদ্রলোকই ও-রকম নাম ধারণ করতে পারে না। যাক ও কথা। এখন আমার প্রশ্নের জবাব দাও দেখি। এ বাগানবাড়ির মালিক নিশ্চয়ই তুমি নও?

না। আমি ভাড়াটে। বাগানবাড়ির মালিক হচ্ছেন চন্দ্রনাথবাবু।

–কে?

–বাবু চন্দ্রনাথ রায়। তিনি শালখেয় থাকেন।

সুন্দরবাবু একটি ছোটখাটো লাফ মেরে বললেন, শুনছ জয়ন্ত? এখানেও আবার সেই অলক্ষুণে চন্দুরে। বাবু ভদ্রেশ্বর, তাহলে তুমি মণিমোহন ছাড়া আর কেউ নও!

–আমি ভদ্রেশ্বর ভদ্র।

–বেশ তোমার ভদ্রতার দৌড় কত বুঝতে দেরি লাগবে না। বাড়িখানা তুমি ভাড়া নিয়েছ কেন?

আমার মিছরির কারখানা আছে। আর আছে আমার এক বন্ধুর মোটরের গ্যারেজ। সেখানে মোটর মেরামত হয়। আমি তার অংশীদার।

তাই নাকি মণিমোহন? তুমি এখন একজন বিজনেসম্যানের ভূমিকায় অভিনয় করতে চাও।

মণিমোহন হাসতে লাগল।

সুন্দরবাবু খেপে গিয়ে বললেন, কে তোমাকে অমন করে হাসতে শিখিয়ে দিলে? আজ সকালে চন্দুরেটাও ঠিক ওইরকম হাড় জ্বালানো হাসি হেসে আমাকে ঠাট্টা করেছে। আর তুমি হাসবেই বা কেন? পুলিশ কি হাস্যকর জীব?

মণিমোহন বললে, ভদ্রেশ্বরের ঘাড়ে মণিমোহন নাম চাপিয়ে দিলে ভদ্রেশ্বরের হাসি পাবে না কেন?

তুমি যে মণিমোহন সেটা থানায় গিয়ে আমিই প্রমাণ করে দেব। এই বাড়িতে আরও কত লোক আছে?

মণিমোহন বললে, আজ রবিবার, কারখানা বন্ধ। বাড়ির ভিতর ঝি চাকর রাঁধুনি ছাড়া আর কেউ নেই।

সুন্দরবাবু তার সহকারী ইনস্পেক্টরকে ডেকে বললেন, তুমি লোকজন নিয়ে খানাতল্লাশি করো। বাড়ির ভিতর থেকে কাউকে বাইরে বেরুতে দিও না। আর জগন্নাথ

আজ্ঞে!

–তুমি দশ নম্বর বলাই শীল স্ট্রিটে মণিমোহনের বাড়িতে যাও। মণির বাবা মহেন্দ্রবাবুকে গিয়ে বলবে তার ছেলেকে পাওয়া গিয়েছে। তাঁকে সঙ্গে করে থানায় ফিরে যাবে। চলো মণিমোহন, তুমি কত বড় ঘুঘু এইবার সেই পরীক্ষাই হবে। এসো জয়ন্ত, এসো মানিক।

মণিমোহন বললে, বেশ মজা তো! কোন অপরাধে আমাকে থানায় নিয়ে যাবেন, তাও আমি জানতে পারব না?

সব জেনেশুনে ন্যাকা সেজো না মণিমোহন। গেল পঁচিশ তারিখে রাত্রিবেলায় গড়ের মাঠে তুমি আর একজন লোকের সঙ্গে নন্দলাল মিত্রকে খুন করেছ। ঘটনাস্থলে তোমাদের পায়ের ছাপ পাওয়া গিয়েছে।

মণিমোহন আবার হাসতে লাগল।

–ফের হাসছ?

–পুলিশের মুখে রূপকথা শুনলে কার না হাসি পায়?

–রূপকথা মানে?

–কে এই নন্দলাল? ডি এল রায়ের হাসির কবিতার সেই বিখ্যাত নন্দলাল নয় তো? কিন্তু কে তাকে খুন করলে? তার কথা পড়ে আমরাই তো হেসে খুন হতুম!

–আবার রসিকতার চেষ্টা হচ্ছে? সেপাই, এই রসিক ব্যক্তিকে আমার গাড়িতে টেনে গিয়ে যাও তো।

মণিমোহন বললে, টেনে নিয়ে যেতে হবে না। আমি জড়পদার্থ নই, সচল পদযুগলের সাহায্যে নিজেই গাড়িতে গিয়ে উঠতে পারি।

–তাই চলো তবে। এসো জয়ন্ত, এসো মানিক।

জয়ন্ত বললে, আমরা যাব না। আমরা এখানকার খানাতল্লাশে যোগ দিতে চাই।

সুন্দরবাবু বিস্মিত স্বরে বলেন, এ আবার কি শখ?

–শখ নয়, খেয়াল। মণিমোহনবাবু, আপনার এখানে ফোন আছে?

–আছে। কিন্তু কেন?

হয়তো ব্যবহার করবার দরকার হবে।

মণিমোহনের মুখের ওপরে ফুটে উঠেই মিলিয়ে গেল একটা দুর্ভাবনার ভাব। সে সহজ স্বরেই বললে, বেশ ব্যবহার করবেন। তবে কি না, যথামূল্যে।

–যথামূল্যে কেন, দ্বিগুণ দিতে রাজি আছি। অগ্রিম।

–পরে পেলে চলবে। আপাতত আমি সুন্দরবাবুর দ্বারা পরীক্ষিত হবার জন্যে উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠেছি। আসুন সুন্দরবাবু, অকারণে বিলম্ব করছেন কেন?

সুন্দরবাবুর মাথা কেমন গুলিয়ে যেতে আরম্ভ করল। জয়ন্ত কেন এখানে থাকতে চায়–কাকে সে ফোন করতে চায়? আর মণিমোহনটা কি পাঁড়ঘুঘু রে বাবা, খুনের আসামি হয়েও থানায় যাবার জন্যে পুলিশকেই তাড়া লাগাচ্ছে!

এইসব ভাবতে-ভাবতে সুন্দরবাবু প্রস্থান করলেন।

পরের দৃশ্য থানায়। চেয়ারাসীন সুন্দরবাবু। দুইজন পাহারাওয়ালার মাঝখানে দণ্ডায়মান মণিমোহন।

মণিমোহন বললে, পরীক্ষা শুরু করতে আজ্ঞা হোক।

–হুম, ভারি ব্যস্ত যে! তোমার বাবার জন্যেও একটু অপেক্ষা করতে পাচ্ছ না?

আমার বাবা!

–হ্যাঁ, হ্যাঁ, এখনি তোমার বাবা এখানে আসবেন।

–মশাই কি ভূত নামাতেও জানেন?

তার মানে?

–আমার বাবা স্বর্গে। সেখান থেকে কেমন করে তাকে এখানে আনবেন?

–একটু সবুর করলেই দেখতে পাবে। না, না, তার আগেও আর একটা পরীক্ষা করা যেতে পারে।

করুন মশাই, করুন। একটা থেকে একশোটা পর্যন্ত পরীক্ষা করতে পারেন। কিন্তু তার বেশি পরীক্ষা আমি দিতে পারব না।

মনে-মনে উত্তপ্ত হয়েও সুন্দরবাবু মুখে কিছু বললেন না। একটা কাগজের মোড়ক খুলে এক জোড়া জুতো বার করে শুধোলেন, এই জুতোজোড়া চিনতে পারো?

উঁহু। আমার জুতো চেনা ব্যবসা নয়। আমি মিছরির ব্যাপারী।

–ঘটনাস্থলে তোমার পায়ের ছাপ পাওয়া গিয়েছে। বাড়ি থেকেই এই জুতো এনেছি– এ জুতো তোমারই। একবার জুতো জোড়া পায়ে পরো দেখি।

মণিমোহন জুতোর ভিতর পা গলাবার চেষ্টা করে বললে, এ জুতো ছোট। এর মধ্যে পা ঢোকানো অসম্ভব!

সুন্দরবাবুর ইঙ্গিতে পাহারাওয়ালা দুজন মণিমোহনের পায়ে জোর করে জুতো পরাবার চেষ্টা করলে। তাদের চেষ্টাও সফল হল না।

সুন্দরবাবুর দুই ভ্রূ সঙ্কুচিত। মণিমোহনের কৌতুক-হাস্য।

ঠিক সেই সময়ে জগন্নাথের সঙ্গে ঘরের ভিতরে প্রবেশ করলেন মণিমোহনের পিতা মহেন্দ্রবাবু।

অকুলে যেন কুল পেয়ে সুন্দরবাবু শুধোলেন, মহেন্দ্রবাবু একে চেনেন?

মণিমোহনের দিকে তাকিয়ে মহেন্দ্রবাবুর চোখ উঠল চমকে। আরও দুই পা এগিয়ে তার কাছে গিয়ে ভালো করে দেখে তিনি বললেন, না, এঁকে আমি চিনি না!

–এ কি মণিমোহন নয়?

–এঁকে প্রায় মণিমোহনের মতো দেখতে বটে, কিন্তু ইনি আমার পুত্র নন।

সুন্দরবাবুর ভুড়ি যেন চুপসে ছাদা বেলুনের মতো। এবং ঠিক সেই সঙ্গেই বেজে উঠল টেলিফোন যন্ত্র। বিরক্তিভাবে রিসিভারটা তুলে নিয়ে ক্ষীণ কণ্ঠে সুন্দরবাবু বললেন, হ্যালো!

রিসিভারের ভিতর দিয়ে জয়ন্তের কণ্ঠ ভেসে এল–জাগ্রত হোন সুন্দরবাবু। আসল মণিমোহনকে দেখতে চান তো বায়ুবেগে আবার বাগানবাড়িতে ছুটে আসুন।

সুন্দরবাবুর চুপসে যাওয়া ভুঁড়ি আবার ফুলে উঠল। একসঙ্গে রিসিভার ও চেয়ার ত্যাগ করে তিনি চেঁচিয়ে বলে উঠলেন সেপাই! আসামিকে লক আপে নিয়ে যাও, এ বেটাও এক ঝকের আর-একটা ঘুঘু। খুব হুঁশিয়ার।

.

শালখের চন্দুরে

মানিক শুধোলে, জয়ন্ত এক যাত্রায় পৃথক ফল হল কেন? আমরাও তো সুন্দরবাবুর সঙ্গেই যেতে পারতুম।

–যেতে তো পারতুমই, কিন্তু যাওয়া আর হল কই?

–তুমি কি নতুন কোনও সূত্র আবিষ্কার করতে পেরেছ?

–কিছুই আবিষ্কার করতে পারিনি।

তবে?

–মনে একটা সন্দেহ জাগছে!

কী সন্দেহ?

–মণিমোহন স্বেচ্ছায় ধরা দিলে কেন?

–স্বেচ্ছায়?

–নিশ্চয়! সে খুনের মামলার পলাতক আসামি। এ-বাড়িতে টেলিফোন আছে। তার বন্ধু চন্দ্রনাথ পুলিশের কার্যকলাপের কথা নিশ্চয়ই তাকে জানিয়েছে। এ-সময়ে তার কতটা সাবধান হয়ে থাকবার কথা। তুমি কি বিশ্বাস করো, দিনেরবেলায় বাগানের ভিতরে সদলবলে পুলিশের আবির্ভাব হল আর অতি-জাগ্রত খুনের আসামি মণিমোহন তা জানতে পারেনি? অম্লান বদনে ভেড়ার মতো সুড়সুড় করে এসে সে আত্মসমর্পণ করলে। কেবলই কি আত্মসমর্পণ? তাড়াতাড়ি থানায় যাওয়ার জন্যে তার বিপুল আগ্রহও লক্ষ করলে তো?

হ্যাঁ। কিন্তু তুমি কি বলতে চাও?

–এসব অস্বাভাবিক ব্যাপার। আমার দৃঢ় ধারণা, মণিমোহনের ইচ্ছা ছিল তাকে গ্রেপ্তার করেই আমরা এ-বাড়ি ছেড়ে চলে যাই।

–এমন অদ্ভুত ইচ্ছা তার হবে কেন?

–সে জানে, পুলিশ গ্রেপ্তার করেও তাকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হবে।

–ধেৎ, তাও কি সম্ভব! চন্দ্রনাথের কাছ থেকে সে নিশ্চয়ই শুনেছে পুলিশের কাছে। তার পায়ের ছাপ আছে।

খুব সম্ভব তার জুতোর সঙ্গে সে ছাপ মিলবে না।

–কি যে বলছ জয়ন্ত!

–খুব সম্ভব সে মণিমোহন নয়, অন্য কেউ।

–তুমি পাগল হয়ে গেলে নাকি? পুলিশের চর জগন্নাথ আগে থাকতেই মণিমোহনকে চেনে। সে নিজে তাকে শনাক্ত করেছে।

–সে মণিমোহন হলে কিছুতেই যেচে ধরা দিত না। যে খুনের আসামি পুলিশের ভয়ে লুকিয়ে থাকে, সে কখনও হাসতে হাসতে যেচে ধরা দেয়? অসম্ভব মানিক, অসম্ভব!

কিন্তু জগন্নাথ তাকে শনাক্ত করেছে।

–সে মণিমোহন নয় বটে, কিন্তু হয়তো প্রায় মণিমোহনেরই মতো দেখতে!

মানিক বিস্ময়ে হতবাক।

জয়ন্ত বললে, এ ছাড়া এমন ব্যাপারের আর কোনও অর্থই হয় না। এই বাড়ির ভিতর নিশ্চয়ই কোনও রহস্য আছে! তাই জাল মণিমোহন আমাদের বিপথে চালনা করে এই বাড়ি থেকে দূরে নিয়ে যেতে চায়।

–কিন্তু সুন্দরবাবু বিপদগামী হলেও এখনও আমরা যথাস্থানেই বর্তমান আছি।

–হ্যাঁ মানিক। রহস্যভেদের ভার গ্রহণ করব আমরাই।

–কেমন করে?

–তা জানি না। ওই যে সাব-ইনস্পেকটার পরেশবাবু আমাদের দিকেই আসছেন। ওঁর মুখ দেখেই বোঝা যাচ্ছে খানাতল্লাশির ফল সন্তোষজনক হয়নি।...কি পরেশবাবু কতখানি অগ্রসর হলেন?

পরেশবাবু হতাশভাবে বললেন,–অগ্রসর কি মশাই, এখন আমাদের সুন্দরবাবুর পশ্চাদগামী হতে হবে।

–খানাতল্লাশ করে সন্দেহজনক কিছুই পেলেন না বুঝি?

–কিছু না, কিছু না।

–তাই থানায় ফিরে যেতে চান?

তা ছাড়া আর কি! এখানে বসে আর অশ্বডিম্বে তা দিয়ে কি হবে? এর চেয়ে বাড়িতে ফিরে ভেরেণ্ডা ভাজা ভালো।

বাড়ির লোকজনদের পরীক্ষা করেছেন?

করেছি। লোকজন তো ভারি! দুটো বেহারী চাকর, একটা উড়িয়া বামুন, একটা বুড়ি, আর একটা ছুঁড়ি ঝি। ঘুড়িটা দেশ থেকে নতুন এসেছে। এত লজ্জা যে কথা কইবে কি, মুখের ঘোমটা খুলতেও নারাজ।

–আপনার লোকজনরা কোথায়?

–তাদের গাড়িতে গিয়ে বসতে বলে আমি আপনাদের ডাকতে এসেছি।

জয়ন্ত হঠাৎ সক্রোধে গর্জন করে উঠল, পরেশবাবু!

মানিক চমকে উঠল। জয়ন্ত তো সহজে এমন বিচলিত হয় না। পরেশও হতভম্ব!

–পরেশবাবু, আপনি অত্যন্ত অন্যায় করেছেন–এসো মানিক, শিগগির। মানিকের হাত ধরে টেনে জয়ন্ত দ্রুতপদে অগ্রসর হল এবং যেতে যেতে মুখ ফিরিয়ে পরেশবাবুকে বলে গেল, তাড়াতাড়ি বাড়ির চারদিকে আবার পাহারা বসান।

পরেশবাবু মাথা চুলকোতে চুলকোতে নিজের মনেই বললে, বড়বাবু বলেন জয়ন্তবাবুর মাথায় ছিট আছে। কথাটা মিথ্যা নয়! শখের গোয়েন্দা হয়ে কিনা আসল পুলিশকে ধমক দেয়। কি আর করব, বড়বাবুই ওঁকে মাথায় তুলেছেন।

জয়ন্ত ও মানিক বাড়ির ভিতরে প্রবেশ করল। কয়েক পদ অগ্রসর হয়ে দেখল দালান ও উঠান এবং দালানের কোণে দ্বিতলে ওঠবার সিঁড়ি।

সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে তারা দোতলার দালানের ওপরে গিয়ে দাঁড়াল। দালানের এক পাশে দাঁড়িয়ে কয়েকজন স্ত্রী-পুরুষ জটলা করছিল। তাদের দেখেই তারা একেবারে চুপ মেরে গেল। একটি অল্পবয়স্কা স্ত্রীলোক তাড়াতাড়ি মুখে ঘোমটা টেনে দিয়ে জড়সড়ো হয়ে রইল।

প্রায় মিনিটখানেক স্তব্ধভাবে দাঁড়িয়ে থেকে জয়ন্ত বললে, তোমাদের কেউ একবার এদিকে এগিয়ে এসো তো।

একটি বুড়ি এগিয়ে এল পায়ে-পায়ে।

জয়ন্ত শুধোল, তুমি কে?

–আমি এ বাড়ির পুরোনো ঝি।

–তোমার নাম কী?

–ভালোর মা।

–আর ওই মেয়েটি?

–ও আমাদের নতুন ঝি। দিন তিনেক হল দেশ থেকে এসেছে।

–হ্যাগো বাছা নতুন ঝি, তোমার নাম কী?

সে ফিশফিশ করে কী বললে শোনা গেল না।

ভালোর মা বললে, ওর বড় নজ্জা বাবু। ওর নাম হরিদাসী।

আচ্ছা ভালোর মা, তোমাদের টেলিফোন আছে কোন ঘরে?

ভালোর মা দেখিয়ে দিলে অঙ্গুলি নির্দেশে। সিঁড়ির ডান পাশে টেলিফোনের ঘর।

দ্যাখো ভালোর মা, তোমরা সবাই এইখানে দাঁড়িয়ে থাকো। আমি টেলিফোনের কাজ সেরে তোমাদের সঙ্গে কথা কইব।

জয়ন্তের সঙ্গে মানিক টেলিফোনের ঘরে গেল। পাঠকদের নিশ্চয় মনে আছে, জয়ন্ত সুন্দরবাবুকে এই কথাই জানিয়ে দিলে যে–জাগ্রত হোন সুন্দরবাবু! আসল মণিমোহনকে দেখতে চান তো বায়ুবেগে আবার বাগানবাড়িতে ছুটে আসুন।

মানিক বিস্মিত কণ্ঠে বললে, কোথায় আছে আসল মণিমোহন?

–এই বাড়িতেই।

–তাকে তুমি দেখেছ?

–হ্যাঁ, তুমিও দেখবে এসো।

দুজনে আবার দালানে গিয়ে উপস্থিত। ভালোর মা প্রভৃতি তখনও দাঁড়িয়ে আছে।

তাদের ওপরে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে জয়ন্ত বললে, ভালোর মা, তোমাদের সকলকেই আমি এইখানেই হাজির থাকতে বললুম না।

–আমরা তো হাজির আছি বাবু!

–কিন্তু হরিদাসী কোথায়?

–সেও আছে।

–কোথায় আছে? আমি তাকে দেখতে পাচ্ছি না কেন?

–সে বাসন মাজতে গিয়েছে।

–কোথায়? কলতলায়?

–না, খিড়কির পুকুরে।

–তোমাদের আবার খিড়কির পুকুর আছে বুঝি? কিন্তু কোন দিক দিয়ে সে গেল? ফোন করতে করতে আমি সিঁড়ির ওপরে চোখ রেখেছিলাম, ওখান দিয়ে কেউ যায়নি।

আমাদের অন্দরমহলে আর একটা সিঁড়ি আছে।

জয়ন্তের মুখে ফুটে উঠল দারুণ হতাশা, কিন্তু সহজ স্বরেই সে বললে, আমাকে খিড়কির পুকুরে নিয়ে চলো।

ছোট একটা পুকুর। নোংরা জল। ভাঙা ঘাট। চারপাড়েই আগাছার ভিড়। কিন্তু সেখানেও হরিদাসীর পাত্তা মিলল না।

জয়ন্ত কঠিন স্বরে বললে, এর পর তুমি কী বলতে চাও ভালোর মা?

ভালোর মা ভয়েভয়ে বললে, কী জানি বাবু, আমি কিছুই বুঝতে পারছি না!

জয়ন্ত তিক্ত স্বরে বললে, দেখছ মানিক, নিরেট পরেশটা বাড়ির চারদিকে এখনও পাহারা বসায়নি? সে-ই হচ্ছে যত অনিষ্টের মূল। তার ওপরে নির্ভর করেই আমি হরিদাসীকে ছেড়ে ফোন করতে গিয়েছিলুম।

কিন্তু হরিদাসী কে?

–সে কথার জবাব একটু পরে দেব। আপাতত ভালোর মাকে তোমার জিম্মায় রেখে আমি একটু উদ্যান-ভ্রমণ করে আসি। জয়ন্ত চলে গেল দ্রুতপদে।

অনতিবিলম্বে ব্যস্তভাবে এসেই সুন্দরবাবু বলে উঠলেন, মানিক, তুমি একা কেন?

জয়ন্ত উদ্যান-ভ্রমণে গিয়েছে।

–এই কি উদ্যান-ভ্রমণের সময়?কোথায় তোমাদের আসল মণিমোহন?

–ওই যে জয়ন্ত আসছে, ওকেই জিজ্ঞাসা করুন।

–জয়ন্ত, মণিমোহন কোথায়?

একখানা শাড়ি আর একটা সেমিজ মাটির ওপরে নিক্ষেপ করে জয়ন্ত বললে, জামাকাপড় আমাদের উপহার দিয়ে মণিমোহন এখান ছেড়ে প্রস্থান করেছে।

–আরে হুম! এ তো দেখছি স্ত্রীলোকের জামা-কাপড়!

–হ্যাঁ সুন্দরবাবু, মণিমোহন স্ত্রীলোকের ছদ্মবেশেই বাড়ির ভিতর লুকিয়েছিল। তারপর নারীর খোলস ত্যাগ করে বাগানের পাঁচিল ডিঙিয়ে লম্বা দিয়েছে। এর জন্য দায়ী হচ্ছেন। আপনাদের পরেশবাবু। তিনি সেপাইদের সরিয়ে নিয়ে না গেলে এ বিপত্তি ঘটত না।

রাগে ফুলতে-ফুলতে সুন্দরবাবু বললেন, বটে, বটে! আচ্ছা, তার সঙ্গে পরে বোঝাঁপড়া করব। কিন্তু তুমি মণিমোহনকে চিনতে পারলে কেমন করে?

জয়ন্ত বললে, মণিমোহন এখানে দাসী হরিদাসী সেজেছিল। সে নাকি পাড়াগেঁয়ে মেয়ে, সবে কলকাতায় এসেছে, এখনও লজ্জা ভাঙেনি, বাইরের লোক দেখলেই ঘোমটা টেনে বোবা হয়ে থাকে। আমাদের দেখে ও চট করে ঘোমটা টেনে দিলে, আমিও কিন্তু তার আগেই চট করে হরিদাসীর মুখ দেখে নিলুম। সে মুখ হরিদাসীর মুখ নয়, সে মুখ দেখতে প্রায় ভদ্রেশ্বর ভদ্রের মতো।

সুন্দরবাবু বললেন, মহেন্দ্রবাবু বলেছেন, ভদ্রেশ্বরের মুখ নাকি প্রায় তার ছেলে মণিমোহনেরই মতো দেখতে। এই জন্যেই জগন্নাথ তাকে মণিমোহন বলে ভ্রম করে আমাদের নাকানি-চোবানি খাইয়ে মেরেছে।

–হ্যাঁ সুন্দরবাবু, জগন্নাথের ভ্রমের কথা আমি আগেই আন্দাজ করতে পেরেছিলুম। হরিদাসীর পুরুষত্বের দ্বিতীয় প্রমাণ পেলুম তার পা লক্ষ করে। জানেন তো, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অনাবৃত পা দেখলেই খুব সহজেই ধরা যায় যে, কে নারী আর কে নয়? তার ওপরে হরিদাসীর আঙুলে আর গোড়ালিতে ছিল বড় বড় কড়া। পাড়াগাঁয়ে গরিবের মেয়ে

জুতো পরে না, পায়ে কড়া পড়বে কেন? সে কথা কয় ফিশফিশ করে, এও সন্দেহজনক। লজ্জার ছুতো বাজে, সে নিজের পুরুষকণ্ঠ চাপা দিতে চায়। সুন্দরবাবু, আপনার সহকারী পরেশবাবু নিশ্চয় খুব হুঁশিয়ার ব্যক্তি, নইলে এতগুলো প্রমাণ তার নজর এড়িয়ে যায়?

সুন্দরবাবু দুঃখিতভাবে মাথা নাড়তে নাড়তে বললেন, সবই আমার অদৃষ্ট ভাই! জাল ছিঁড়ে মাছ পালিয়ে যাবে বার বার! তার ওপরে দেখ না, মন বলছে, শালখের ওই চন্দুর ব্যাটাই হচ্ছে এই দলের মোড়ল, অথচ তার বিরুদ্ধে একটা প্রমাণও জোগাড় করতে পারছি না।

জয়ন্ত মুখ টিপে একটু হেসে বললে, বিলাতি প্রবাদে বলে, শয়তানের কথা ভাবলেই শয়তানের উদয় হয়! ওই দেখুন, কে আসছে!

সুন্দরবাবু ফিরে বিস্ফারিত চক্ষে দেখলেন, হাতের মোটা লাঠিগাছা ঘোরাতে-ঘোরাতে, হেলতে-হেলতে, দুলতে-দুলতে এবং হাসতে হাসতে এগিয়ে আসছে শালিখার চন্দ্রনাথ রায়।

.

দুজন বেপরোয়া লোক

আগতপ্রায় চন্দ্রনাথের দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে মাথা চুলকোতে-চুলকোতে সুন্দরবাবু বললেন, হুম!

চট করে কী ভেবে জয়ন্ত তাড়াতাড়ি বলে উঠল, সুন্দরবাবু, হুম বলে থ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকবেন না। শিগগির বাড়ির ভিতর যান।

–কেন বল দেখি? চন্দুরের ভয়ে?

ভয়ে নয়, আপনাকে থানায় একটা ফোন করতে হবে।

কী জন্যে?

–সেপাইদের জিম্মায় ভদ্রেশ্বরকে একবার এখানে নিয়ে আসুন, আমি তাকে গুটিকয় প্রশ্ন করব।

–উত্তম।

দাঁড়ান। আর একটা কথা। সেই সঙ্গে মণিমোহনের জুতোর ছাঁচও পাঠিয়ে দিতে বলবেন।

–এখানে? কেন হে?

–সে কথা বলবার সময় নেই। ওই চন্দ্রনাথ এসে পড়েছে।

সুন্দরবাবুর প্রস্থান। চন্দ্রনাথ বুক ফুলিয়ে কাছে এসে দাঁড়াল। মুখ টিপে হাসতে-হাসতে শুধোলে, সুন্দরবাবু সরে পড়লেন কেন? আমার চন্দ্রবদন দেখতে রাজি নন?

মানিক হেসে উঠে বললে, মশাই কি নিজের বদনকে চন্দ্রবদন বলে সন্দেহ করেন?

চন্দ্রনাথ আরও জোরে হেসে উঠে বললে, না মশাই, তা করি না। পিতার ভ্রমে নামেই আমি চন্দ্রনাথ। আর সত্য কথা বলতে কি চন্দ্রবদনের মালিক হলে আমি সুখী হতুম না।

দুঃখিত হতেন?

–ঠিক তাই। পূর্ণচন্দ্রের বদন আকাশেই মানায়। ও-রকম অখণ্ডমণ্ডলাকার বদন কোনও মানুষকেই সুখী করতে পারে না। যাক সে কথা। এখন আপনারা কে বলুন দেখি? মানিকজোড়ের মতো সর্বদাই সুন্দরবাবুর আশেপাশে বিরাজ করেন?

–ঠিক ধরেছেন। আমার নাম মানিকই বটে, আর জয়ন্তও আমার জোড়াই বটে।

–নাম তো শুনলুম, এখন পরিচয়টাও দিতে আজ্ঞা হয়।

–ওই সুন্দরবাবু আসছেন। আমাদের পরিচয় ওঁর মুখেই শুনতে পারেন।

কিন্তু সুন্দরবাবুর কাছ থেকে জয়ন্ত ও মানিকের পরিচয় জানবার জন্য চন্দ্রনাথ কোনও আগ্রহই প্রকাশ করলে না। হাত জোড় করে নমস্কার করে যেন ব্যঙ্গের স্বরেই বললে, আসুন সুন্দরবাবু।

অনিচ্ছাসত্ত্বেও প্রতি নমস্কার করে সুন্দরবাবু অপ্রসন্ন স্বরে বললেন, হুম্ এই আমি এসেছি। কিন্তু আপনি এখানে এসেছেন কেন?

কী আশ্চর্য প্রশ্ন!

আশ্চর্য প্রশ্ন?

–কেবল আশ্চর্য নয়, যুক্তিহীন প্রশ্ন।

–মানে?

–আমি এখানে আসব না তো, আসবে কে? আপনি বোধহয় জানেন না, এ বাড়ির মালিক হচ্ছি আমি।

–খুব জানি বাবা, খুব জানি! আর জানি বলেই তো আজ আপনাকে আমি গ্রেপ্তার করব?

–গ্রেপ্তার করবেন? আমি এই বাড়ির মালিক বলে আমাকে আপনি গ্রেপ্তার করবেন?

–হ্যাঁ, হা, হ্যাঁ!

–না, না, না। বাড়ির মালিক হওয়াও অপরাধ নাকি?

–যে বাড়ির ভিতরে খুনি আসামি আশ্রয় পায় তার মালিক হওয়া অপরাধ বইকী!

–কে খুনি আসামি?

–আপনার স্যাঙাত মণিমোহন।

তার সঙ্গে এ বাড়ির সম্পর্ক কী?

–সে এখানে ছদ্মবেশে লুকিয়েছিল।

–আমি এ কথা বিশ্বাস করি না। আর একথা সত্য হলেও আপনি আমাকে গ্রেপ্তার করতে পারেন না।

–পারি না নাকি!

–না। আমি এই বাড়ির মালিক বটে, কিন্তু এখানা ভাড়া দিয়েছি ভদ্রেশ্বরবাবুকে। আজ তার কাছে আমি ভাড়ার টাকা আদায় করতে এসেছি। ভদ্রেশ্বরবাবুর বাড়ির ভিতর কে থাকে, আর না থাকে, তার কোনও খবরই আমি রাখি না। কোন আইন অনুসারে আপনি আমাকে গ্রেপ্তার করবেন? চুপ করে রইলেন কেন, বলুন? কোন আইন অনুসারে আপনি আমাকে গ্রেপ্তার করবেন সুন্দরবাবু? এখনও বোবা হয়ে রইলেন? হা হা হা হা হা! গ্রেপ্তার করবেন। গ্রেপ্তার করলেই হল!

সুন্দরবাবুর হতাশ ভাব। অসহায়ের মতো তিনি তাকালেন জয়ন্তের মুখের পানে।

জয়ন্ত বললে, না চন্দ্রবাবু আপনাকে কেউ গ্রেপ্তার করতে পারে না, সুন্দরবাবু বলেছিলেন কথার কথা মাত্র। ওকথায় আপনি কান দেবেন না। ওই দেখুন, আর একখানা জিপগাড়ি বাগানের ভিতরে এসে দাঁড়াল। গাড়ি থেকে কে নামছে? ভদ্রেশ্বরবাবু না?

সুন্দরবাবুর মুখ কিঞ্চিৎ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। কিন্তু ওদিকে তাকিয়ে অনুচ্চস্বরে তিনি বললেন, ভদ্রেশ্বর বেটাও আসছে ঠিক চন্দুরের মতো বুক ফুলিয়ে বেপরোয়াভাবে। এমন দুজন বেপরোয়া লোককে সচরাচর একসঙ্গে দেখা যায় না। এ আমি কোথায় এসে পড়েছি বাবা!

কাছে এসে এক গাল হেসে ভদ্রেশ্বর বললে, আরে সুন্দরবাবু! মশাই, এত তাড়াতাড়ি আপনি যে আমাকে বাসায় ফিরতে দেবেন, আমি ভাবতেই পারিনি। তারপর? আপাতত এদিককার খবর-টবর সব ভালো তো?

সুন্দরবাবু গুম হয়ে গিয়ে বললেন, মোটেই ভালো নয়–অন্তত তোমার পক্ষে।

ভদ্রেশ্বর চক্ষু বিস্ফারিত করে যেন সভয়েই বললে, অ্যাঁ, বলেন কী! খবর আমার বিপক্ষে?

–হুম, তাই। খবর তোমার বিপেক্ষই বটে।

–হায় হায়! কেন এমনটা হল?

–তুমি খুনি আসামি মণিমোহনকে এই বাড়ির ভিতরে লুকিয়ে রেখেছিলে।

বটে, বটে, বটে! মণিমোহন নামধেয় সেই কাল্পনিক ব্যক্তিটি এখনও আপনার ঘাড় ছেড়ে নামতে রাজি হয়নি? একটু আগে আমিই ছিলুম মণিমোহন। এখন স্থির করেছেন, মণিমোহন এই বাড়ির ভিতর লুকিয়ে আছে।

না, এখন সে বাড়ির ভিতর নেই। সে লম্বা দিয়েছে।

–আপনার চোখে ধুলো দিয়ে?

–এ জন্যেও তুমি দায়ী! মণিমোহনের সঙ্গে তোমার চেহারার খানিকটা মিল আছে। সেই সুযোগ গ্রহণ করে তুমি যদি আমাকে ভুলিয়ে এখান থেকে সরিয়ে না নিয়ে যেতে, তাহলে মণিমোহন কখনওই পালাতে পারত না।

যত দোষ নন্দ ঘোষ। মশাই, আমার আর রূপকথা শোনবার বয়স নেই। পথ দেখুন কিংবা পথ ছাড়ুন। আমাকে বাড়ির ভিতরে যেতে দিন।

বাড়ির ভিতরে যাবে মানে! মামারবাড়ির আবদার নাকি! তোমাকে আমাদের সঙ্গে আবার থানায় যেতে হবে।

–কেন?

কতবার বলব? খুনি আসামিকে তুমি লুকিয়ে রেখেছিলে।

–কোথায় সে? প্রমাণ দেখান।

–সে এখানে হরিদাসী নাম নিয়ে স্ত্রীলোকের ছদ্মবেশে লুকিয়ে ছিল।

ভদ্রেশ্বর আগে হা হা করে খুব খানিকটা হেসে নিলে। তারপর বললে, বাহবা কী বাহবা! মণিমোহন আগে ছিল শ্রীমান ভদ্রেশ্বর, কিন্তু এখন সে হয়েছে শ্রীমতী হরিদাসী? চমৎকার! মশাই গাঁজা-টাজা খান না তো?

–চোপরাও বদমাইস?

–মোটেই চুপ করব না। হরিদাসীকে আগে এখানে নিয়ে আসুন।

–পুলিশ দেখে সে পালিয়ে গিয়েছে কেন?

–পালিয়ে গিয়েছে বলেই ধরে নিতে হবে যে স্ত্রীলোক নয় পুরুষ, হরিদাসী নয়, মণিমোহন? এটা কোন দেশের যুক্তি? হরিদাসী পাড়াগেঁয়ে ভিতু মেয়ে, নতুন শহরে এসেছে, পুলিশ দেখে সে তো ভয়ে পালিয়ে যাবেই।

সুন্দরবাবুর অবস্থা আবার অসহায় হয়ে পড়ল। জয়ন্তকে একটু তফাতে নিয়ে গিয়ে নিম্নস্বরে বললে, ভায়া, যেমন ওই চন্দুরেটা, তেমনি এই ভদ্রেশ্বরবটাই মাছের মতো পিছল, ধরলেও হাত ছাড়িয়ে পালিয়ে যায়। তোমার কথাতেই ওকে এখানে নিয়ে এসেছি, এখন তুমিই ওর মুখ বন্ধ করার ব্যবস্থা করো।

জয়ন্ত বললে, বেশ তাই করছি। আমি আর একবার বাড়ির ভিতরে যাব। ততক্ষণে আপনি মণিমোহনের জুতোর ছাঁচ গাড়ি থেকে আনিয়ে রাখুন। এসো মানিক।

দোতলার দালানে দাস-দাসীরা তখনও দাঁড়িয়েছিল।

জয়ন্ত বললে, হ্যাঁ ভালোর মা, হরিদাসী কি রাতে তোমার সঙ্গেই শুত?

ভালোর মা বললে, না বাবু, সে শুত একলা অন্য ঘরে।

–বেশ, সে ঘরখানা একবার আমরা দেখতে চাই।

ভালোর মা তাদের ভিতর-মহলে নিয়ে গিয়ে একখানা ঘর দেখিয়ে দিল।

ঘরের ভিতরে ঢুকে মানিক বললে, জয়ন্ত, কী উদ্দেশ্যে তুমি এ ঘরখানা দেখতে চাও?

জয়ন্ত বললে, মানিক কায়ার পিছনে ছায়ার মতো কেবল আমার সঙ্গে সঙ্গে থেকে কোনই লাভ নেই। যা সচক্ষে দেখছ আর স্বকর্ণে শুনছ, তা নিয়ে তোমারও স্বাধীন চিন্তাশক্তি ব্যবহার করা উচিত। এ ঘরে যে একবার আমাদের আসতেই হবে, আমি তা আগে থাকতেই জানতুম। আর সেই জন্যেই থানা থেকে মণিমোহনের পদচিহ্নের ছাঁচ এখানে আনিয়ে রেখেছি।

মানিক বললে, তুমি কি এই ঘরের মেঝেতে মণিমোহনের নতুন পদচিহ্ন আবিষ্কার করতে চাও?

–সে চেষ্টা বোধহয় সফল হবে না!

তবে?

-হরিদাসী যে পুরুষ, এটা আমার সন্দেহ মাত্র। কিন্তু আসল প্রশ্ন হচ্ছে, পুরুষ হলেও সে সত্য সত্যই মণিমোহন কি না? এই ঘরে এই প্রশ্নের উত্তর পাবার সম্ভাবনা আছে।

যুক্তিটা মাথায় ঢুকছে না।

নিরেটদের মাথায় পেরেকও ঢোকে না। সুন্দরবাবুর সঙ্গগুণে তুমি একটি নিরেট হয়ে উঠছ। নির্বোধ, হরিদাসী যদি ছদ্মবেশী পুরুষ হয় তাহলে এই ঘরে নিশ্চয়ই তার পুরুষ-বেশ ধারণের উপকরণ খুঁজে পাওয়া যাবে। পুলিশের ভয়ে তাড়াতাড়ি পালাবার সময়ে সেগুলো যে সে নিয়ে যেতে পারেনি, তাতে আর কোনওই সন্দেহ নেই। হ্যাঁ, যা ভেবেছি তাই। টেবিলের ওপরে রয়েছে রুপোর সিগারেট কেস আর দেশলাই। আলনায় দু-খানা শাড়ি, একটা সেমিজ আর একটা ব্লাউজ ঝুলছে বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে রয়েছে দুখানা ধুতি আরদুটো পাঞ্জাবিও। মানিক, হরিদাসী পুরুষই বটে!

সিগারেট-কেসটা টেবিলের ওপর থেকে তুলে নিয়ে মানিকের সামনে ধরে জয়ন্ত বললে, দেখ। এর ওপরে ইংরাজিতে খোদাই রয়েছে এম। ওটা মণিমোহনের নামের আদ্য অক্ষর বলে গ্রহণ করা যেতে পারে কি না?

মানিক সায় দিয়ে বললে, হ্যাঁ, এটা একটা বড় প্রমাণ।

এদিক-ওদিক ঘোরাঘুরি করে ও এটা-ওটা-সেটা নিয়ে নাড়ানাড়ি করতে করতে জয়ন্ত বললে, তবু আমি যা খুঁজছি তা পাচ্ছি না। তারপর হেঁট হয়ে পড়ে খাটের তলায় দৃষ্টিচালনা করে জয়ন্ত উৎফুল্ল কণ্ঠে বলে উঠল, পেয়েছি মানিক, পেয়েছি।

কী?

–খাটের তলায় রয়েছে এক জোড়া জুতো। ব্যস, আপাতত আমাদের খোঁজাখুঁজি শেষ। মানিক জুতোজোড়া খাটের তলা থেকে টেনে নিয়ে আমার সঙ্গে চলে এসো।

বাগানে নেমে এসে তারা দেখলে, ভদ্রেশ্বর তখনও সুন্দরবাবুর সঙ্গে কথা কাটাকাটি করছে এবং চন্দ্রনাথ আপন মনে পায়চারি করছে সম্পূর্ণ নির্লিপ্তভাবেই।

সুন্দরবাবু অধীর স্বরে বললেন, ভাই জয়ন্ত, এই ঠোঁটকাটা ভদ্রেশ্বরের লেকচার আর আমি সহ্য করতে পারছি না। এর মুখ বন্ধ করবার কোনও উপায় পেয়েছ কি?

মৃদু হাস্য করে জয়ন্ত বললে, বোধহয় পেয়েছি। মণিমোহনের জুতোের ছাঁচ কোথায়?

–এই যে ভাই, এই যে।

খিলখিল করে হেসে উঠে ভদ্রেশ্বর বললে, আবার ওই ছাঁচের সঙ্গে আমার জুতো মেলানো হবে নাকি?

জয়ন্ত বললে, মোটেই নয়। মণিমোহনের জুতোর ছাঁচের সঙ্গে আমি এই জুতো জোড়া মিলিয়ে দেখব।

ভদ্রেশ্বর সন্দিগ্ধ কণ্ঠে বললে, ও কার জুতো?

ছাঁচের সঙ্গে জুতো মেলাতে-মেলাতে জয়ন্ত বললে, বাঃ, অবিকল মিলে যাচ্ছে। হ্যাঁ, এ হচ্ছে মণিমোহনের জুতো, পাওয়া গিয়েছে হরিদাসীর ঘরে।

সুন্দরবাবু সহর্ষে এবং সদম্ভে বলে উঠলেন, হুম! হুম! বার বার ঘুঘু তুমি খেয়ে যাও ধান–

চন্দ্রনাথ সহসা বললে, ভদ্রেশ্বরবাবু এখন আমি চললুম। ভাড়ার টাকার জন্যে পরে আর একদিন দেখা করব।–সে হন হন করে ফটকের দিকে এগিয়ে চলল।

সুন্দরবাবু ব্যস্ত হয়ে বললেন, আরে গেল, চন্দুরেটা পালায় যে!

জয়ন্ত বললে, ওকে যেতে দিন সুন্দরবাবু! চন্দ্রনাথকে গ্রেপ্তার করতে পারি, এমন কোনও প্রমাণ আমাদের হাতে নেই।

ভদ্রেশ্বর বললে, আপনারা আমাকেও গ্রেপ্তার করতে পারেন না।

জয়ন্ত হাসতে-হাসতে বললে, মণিমোহনের জুতো আবিষ্কারের পরেও!

–ও জুতো নিশ্চয়ই হরিদাসীর ঘরে ছিল না। এসব হচ্ছে পুলিশের কারসাজি।

ভদ্রেশ্বরকে সজোরে একটা ধাক্কা মেরে সুন্দরবাবু বললেন, পাজি, ছুঁচো এখনও বকবকানি। চুপটি মেরে থানায় চল, তোর যা বলবার আদালতে গিয়ে বলবি!

আচম্বিতে গুড়ুম করে একটা শব্দ হল এবং সঙ্গে সঙ্গে জয়ন্ত দুই হাতে নিজের বুক চেপে ধরে মাটির ওপরে বসে পড়ল।

.

পকেট বুকের মহিমা

সুন্দরবাবু প্রথমটা হতভম্বের মতো দাঁড়িয়ে রইলেন, তারপর নিজেকে সামলে নিয়ে ব্যস্তভাবে জয়ন্তর দিকে ছুটে গেলেন। মানিক তার আগেই জয়ন্তের কাছে গিয়ে হাজির হয়েছে।

সুন্দরবাবু বললেন–জয়ন্ত, জয়ন্ত তোমার কোথায় লাগল?

জয়ন্ত টপ করে উঠে পড়ে একটুখানি হেসে বললে, বুকে।

–অ্যাঁ, বলো কী! বুকে গুলি লেগেছে, আর তুমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাসছ।

কান্নার চেয়ে হাসিই আমি পছন্দ করি।

–না, ঠাট্টা রাখো। দেখি কোথায় লেগেছে?

–এই যে বাঁ-দিকের বুক পকেটের উপরে।

সুন্দরবাবু দুই চক্ষু বিস্ফারিত করে সভয়ে বলে উঠলেন, ও বাবা, এ যে একেবারে মোক্ষম আঘাত! গুলি পকেট ছাদা করে ভিতরে চলে গিয়েছে।

মানিক উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বললে, জয়ন্ত, কী করে তুমি এখনও পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছ? চলো, আমরা হাসপাতালে নিয়ে যাই।

জয়ন্ত মাথা নেড়ে বলল, না।

না মানে?

–না মানে, না। হাসপাতালে যাব না।

–সে কী হে?

বন্ধু, শিকারির লক্ষ্য অব্যর্থ বটে, কিন্তু সে লক্ষ্যভেদ করতে পারেনি।

সুন্দরবাবু ভ্যাবাচাকা খেয়ে বললেন, হুম, ও আবার কীরকম কথা?

জয়ন্ত বুক-পকেট থেকে একখানা হৃষ্টপুষ্ট পকেট বই বার করে বললেন, দেখুন।

কী দেখব?

–আততায়ীর বুলেট জামার পকেট ভেদ করে পকেট বইয়ের মলাট আর অনেকগুলো পাতা ফুড়ে আর বেশি এগুতে পারেনি। আমি অক্ষত, আপনি নিশ্চিন্ত হোন।

মানিক উৎফুল্ল কণ্ঠে বললে, জয়ন্ত, ভগবানই তোমাকে বাঁচিয়েছেন।

হ্যাঁ ভাই। কিন্তু কেবল আমাকে নয়, গত মহাযুদ্ধের সময়ে ভগবান এই উপায়ে বহু সৈনিকেরই প্রাণরক্ষা করেছেন।

সুন্দরবাবু খানিকক্ষণ চমৎকৃতের মতো নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। তারপর যেন নিজের মনেই বললেন, আশ্চর্য ব্যাপার।

মানিক চারিদিকে তাকাতে-তাকাতে বললে, কিন্তু বন্দুক ছুড়লে কে?

দুজন পাহারাওয়ালার মাঝখানে এতক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়েছিল ভদ্রেশ্বর। যে মুখ টিপে হেসে বলল, বন্দুকটা যে আমি ছুড়িনি অন্তত এ সম্বন্ধে আপনাদের নিশ্চয়ই কোনও সন্দেহ নেই?

সুন্দরবাবু ধমক দিয়ে বলে উঠলেন, এই চোপ। বন্দুক তুই না ছুঁড়ে থাকিস তোর স্যাঙাত ছুঁড়েছে!

–আমার স্যাঙাত?

-হ্যাঁ হ্যাঁ, সেই পাজি ছুঁচো-উল্লুক মণিমোহন ব্যাটা!

সুন্দরবাবু, আপনাদের ওই মণিমোহন পাজি কিনা জানি না, কিন্তু সে এক সঙ্গে ই ছুঁচো আর উল্লুক হাত পারে না। ওরা হচ্ছে দু-জাতের দুরকম জীব।

–চোপরাও, চোপরাও! তাহলে ছুঁচো হচ্ছিস তুই আর উল্লুক হচ্ছে মণিমোহন।

–মহাশয়, আর-একবার ভ্রম সংশোধন করবার আজ্ঞা হোক।

ভ্রম সংশোধন?

আজ্ঞে হ্যাঁ। মণিমোহন উল্লুক কি না জানি না কিন্তু আমি যে ছুঁচো নই–এ বিষয়ে আপনারা সকলে একমত হতে বাধ্য। আমি মানুষ।

–হুম, হুম! তোর মতো বক্কেশ্বর জীবনে আমি আর দেখিনি। তুমি যদি ফের বক বক করিস তাহলে তোর দুই গালে মারব দুই ধাবড়া।

অতি বিনীতভাবে মাথা কাত করে ভদ্রেশ্বর বললে, দয়াময়, এই আমি গাল পেতে দিলাম। থাবড়া মারবেন তো অনুগ্রহ করে ঝটিতি এগিয়ে আসুন।

সুন্দরবাবু হার মেনে ভদ্রেশ্বরের দিকে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে রুদ্ধ ক্রোধে ফুলতে লাগলেন।

ভদ্রেশ্বর তবু নাছাড়বান্দা। টিটকারি দিয়ে বললে, বেশি ফুলবেন না মশায়, আপনার দোদুল্যমান ভূঁড়ির অসুখ হতে পারে।

সুন্দরবাবু আর পারলেন না, গর্জন করে বলে উঠলেন, সেপাই সেপাই! ভদ্দরেটাকে টানতে-টানতে বাগানের বাইরে নিয়ে যাও। একেবারে গাড়িতে নিয়ে গিয়ে তোলো গে।

ভদ্রেশ্বর বললে, টানাটানি হানাহানির দরকার নেই বাবা! সেপাই অগ্রসর হও! আমি পোষ-মানা ভেড়ার মতো তোমাদের সঙ্গে কুইক মার্চ করব।

ভদ্রেশ্বর বিদায় হলে পর জয়ন্ত বললে, সুন্দরবাবু তাহলে আপনার বিশ্বাস মণিমোহন আমার প্রতি গুলি নিক্ষেপ করেছে?

–সে নয় তো আর কে এ কাজ করতে পারে? ব্যাটা নিশ্চয়ই আড়ালে আড়ালে কোথায় লুকিয়ে আছে? আমার ভয় হচ্ছে, সে যদি আবার গুলি ছোড়ে?

জয়ন্ত বললে, আমি ফটকের দিকে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলুম। গুলিটা এসেছে ওই দিকের কোন ঝোপঝাড় থেকেই।

তাই নাকি, তাই নাকি? তাহলে তো এখনি ওদিকটা ভালো করে খুঁজে দেখতে হয়।

–হ্যাঁ, তাই দেখুন। বাগানের বাইরে পুলিশের কড়া পাহারা আছে, আততায়ী নিশ্চয়ই এখনও বাগান থেকে বেরিয়ে যেতে পারেনি।

হঠাৎ সুন্দরবাবু একেবারে থ। দূরে দেখা গেল, মোটা লাঠিগাছা ঘোরাতে-ঘোরাতে ফটকের দিকে হন হন করে এগিয়ে যাচ্ছে চন্দ্রনাথ।

মানিক সবিস্ময়ে বললে, চন্দ্রনাথ এখনও বাগানের ভিতরে কী করছে?

সুন্দরবাবু চিৎকার করে নিজের সহকারীকে ডেকে বললেন, পরেশ! লোকজন নিয়ে দৌড়ে যাও, চন্দুরেকে আমার কাছে টেনে নিয়ে এসো।

অনতিবিলম্বে পাহারাওয়ালাদের সঙ্গে চন্দ্রনাথের পুনরাগমন। তার চেহারার ভয়-সঙ্কোচের চিহ্নমাত্র নেই, ভাবভঙ্গি অতীব সপ্রতিভ।

–সুন্দরবাবু রুক্ষ স্বরে শুধোলেন, আপনি এতক্ষণ ওখানে কী করছিলেন?

–হাওয়া খাচ্ছিলুম না নিশ্চয়ই।

–পষ্টাস্পষ্টি জবাব দিন। আপনি এতক্ষণ ওখানে কী করছিলেন?

–হঠাৎ শ্রবণ করলুম বন্দুকের শব্দ। পরমুহূর্তে দর্শন করলুম আপনার বন্ধুর পতন। তাই শুনে আর দেখে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ব্যাপারটা কী তলিয়ে বোঝবার চেষ্টা করছিলুম। সেটাও কি বে-আইনি?

সুন্দরবাবু বুলেট বিদ্ধ পকেট-বইখানা চন্দ্রনাথের সামনে ধরে বললেন, দেখুন।

–দেখছি।

–এই পকেট-বই আজ জয়ন্তকে বাঁচিয়েছে।

–বুঝেছি।

–এইবার আমরা আপনার জামাকাপড় খুঁজে দেখব।

–কেন?

–দেখব, জামাকাপড়ের মধ্যে আপনি কোনও আগ্নেয়াস্ত্র লুকিয়ে রেখেছেন কি না?

কীরকম আগ্নেয়াস্ত্র? রাইফেল?

–জামাকাপড়ের ভিতরে রাইফেল লুকিয়ে রাখা চলে না।

–তবে কী খুঁজতে চান? রিভলভার?

ধরুন তাই।

কিন্তু যে বুলেট দেখালেন, ওটা তো রাইফেলের বুলেট। কোনও ছোট আকারের রাইফেলের বুলেট।

–তবু খুঁজে দেখব।

–দেখুন।

খোঁজাখুঁজি ব্যর্থ। বিপজ্জনক কিছুই পাওয়া গেল না।

সুন্দরবাবু বললেন, পরেশ, লোকজন নিয়ে ফটকের ওই দিকে যাও। ঝোপঝাড় খুঁজে রিভলভার টিভলভার কিছু পাও কি না, দেখ।

সদলবলে পরেশের প্রস্থান।

চন্দ্রনাথ হেসে বললে, পাওয়া গেছে রাইফেলের বুলেট, আপনি খুঁজছেন রিভলভার।

–রাইফেলও পেতে পারি।

–আপনার অন্বেষণ সফল হলে খুশি হব।

–আপনার হাতে অমন মোটা লাঠি কেন?

আমার শখ।

–ওরকম শখ ভালো নয়। ভবিষ্যতে রোগা লাঠি নিয়ে আমার সামনে আসবেন।

উপদেশের জন্যে ধন্যবাদ।

খানিক পরে পরেশ ফিরে এসে জানালে, কোথাও কোনওরকম আগ্নেয়াস্ত্রের সন্ধান মিলল না।

চন্দ্রনাথ সকৌতুকে বললে, তাহলে সুন্দরবাবু অতঃপর আমি সসম্মানে বিদায় গ্রহণ করতে পারি?

–হুম!

নমস্কার!

সুন্দরবাবু প্রতি নমস্কার করলেন না। চন্দ্রনাথ চলে গেল।

সুন্দরবাবু বললেন, ভাই জয়ন্ত, এই চন্দুরে আর ওই ভদুরেটা দেখছি আমাকে সাত ঘাটের জল না খাইয়ে ছাড়বে না।

জয়ন্ত বললে, খাওয়ায় যদি তো খেতে হবে। আপাতত কী করবেন?

–আরও ভালো করে খানাতল্লাশি করে দেখি, মণিমোহন কোথাও ঘাপটি মেরে আছে কিনা!

আমি আর মানিক এইবার প্রস্থান করতে চাই।

.

–পরদিন প্রভাতে বেজে উঠল জয়ন্তের টেলিফোন ঘণ্টা।

রিসিভার নিয়ে জয়ন্ত বলল, হ্যালো!

–আমি সুন্দরবাবু।

–আপনার কণ্ঠস্বর উত্তেজিত কেন?

–আবার খুন! আবার চুরি–যে-সে চুরি নয়, নগদ পঞ্চাশ হাজার টাকা আর ত্রিশ হাজার টাকার জড়োয়া গয়না উধাও। আবার পদচিহ্ন।

–পদচিহ্ন?

–হ্যাঁ, মণিমোহন আর সেই অজ্ঞাত ব্যক্তির পদচিহ্ন–যাকে আমরা কোথাও খুঁজে পাচ্ছি না। তুমি শীঘ্র এসো।

–আপনি কোথায়?

–ঘটনাস্থলে।

ঠিকানা?

সাতাশ নম্বর সতীশ বসু স্ট্রিট।

.

অপরিচিতের সুপরিচিতের পদচিহ্ন

সাতাশ নম্বর সতীশ বসু স্ট্রিট। নতুন ঘটনাস্থল। একখানা রেলিংঘেরা মাঝারি আকারের বাড়ি। ফটক পার হলেই পাওয়া যায় খানিকটা খোলা জমি। এইখানে কয়েকজন পুলিশকর্মচারী ও অন্যান্য লোকের সঙ্গে চেয়ার পেতে বসেছিলেন সুন্দরবাবু।

জয়ন্ত ও মানিকের আবির্ভাব।

সুন্দরবাবু বললেন, এসো ভায়া এসো। আগে গোড়ার কথা শুনবে, না একেবারেই বাড়ির ভিতরে যাবে?

জয়ন্ত বললে, আগে গৌরচন্দ্রিকাটা হয়ে যাওয়াটা ভালো।

–হুম, উত্তম! এই বাড়ির মালিকের নাম রামময় মণ্ডল। লোহার ব্যাপারী, ধনী ব্যক্তি, স্ট্র্যান্ড রোডে গদি। সংসার খুব বড় নয়–স্ত্রী, দুই মেয়ে এক ছেলে ও এক ভাই। বহুদিন রোগ-ভোগের পর স্ত্রীর দেহ ভেঙে যাওয়াতে ডাক্তাররা বায়ু পরিবর্তনের পরামর্শ দেন। কাজের চাপের জন্যে রামবাবু নিজে কলকাতা ছাড়তে পারেননি, ছোট ভাইয়ের সঙ্গে পরিবারবর্গকে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন শিমুলতলায়। হঠাৎ পরশু রাত্রে তার ভাইয়ের কাছ থেকে এক টেলিগ্রাম আসে? বউদি মৃত্যুশয্যায়। অবিলম্বে চলে এসো। কিন্তু টেলিগ্রাম পাবার পর ট্রেন ছিল না বলে রামবাবু পরশু রাত্রে শিমুলতলায় যেতে পারেননি। তিনি গতকল্য সকালের ট্রেনে কলকাতা ত্যাগ করেছেন, বাড়ির অতি পুরাতন ও অতি বিশ্বস্ত কর্মচারী দ্বিজদাসের জিম্মায় রেখে।

বাধা দিয়ে জয়ন্ত শুধোলে, দ্বিজদাস ছাড়া বাড়ির ভিতরে আর কেউ ছিল না?

–ছিল। তিন জন বেয়ারা আর দুই জন দ্বারবান। বাড়িখানায় দুটো মহল, সদর আর অন্দর। বেয়ারা আর দারোয়ানের ঘর সদরের একতলায়। দ্বিজদাস ছিল অন্দরের দোতলার একখানা ঘরে রামবাবুর শয়নগৃহের ঠিক পাশেই। আজ সকালে দেখা যায় দোতলার বারান্দার ওপরে পড়ে আছে দ্বিজদাসের মৃতদেহ, কে তার বুকের ওপরে ছোরার আঘাত করেছে। রামবাবুর ঘরের দরজার কুলুপ ভাঙা, ঘরের ভিতরকার লোহার সিন্দুক থেকে অদৃশ্য হয়েছে নগদ পঞ্চাশ হাজার টাকা আর ত্রিশ হাজার টাকার জড়োয়া গয়না।

–অত টাকা ব্যঙ্কে জমা না দিয়ে বাড়ির ভিতরে রাখা হয়েছিল কেন?

টাকাটা রামবাবুর হাতে এসেছিল পরশু বৈকালেই। রাত্রে টেলিগ্রাম পেয়ে রামবাবু দুশ্চিন্তায় পাগলের মতন হয়ে যান। কাল সকালে উঠেই তাকে তাড়াতাড়ি স্টেশনে ছুটতে হয়েছিল বলে তিনি টাকার কোনও ব্যবস্থা করে যেতে পারেননি।

অপরাধীরা কি দলে ভারী ছিল?

জানি না। তবে পদচিহ্ন পেয়েছি দুইজনের। ফোনেই তো বলেছি, দুই পদচিহ্নই আমাদের পরিচিত। এক চিহ্নের মালিক মণিমোহন, অন্য চিহ্নের মালিক আজও অজ্ঞাতবাস করছে।

–তারা বাড়ির ভিতরে ঢুকল কেমন করে?

–খিড়কির দরজা দিয়ে।

–ওখানকার দরজা কি বন্ধ ছিল না?

–ছিল বলেই তো শুনেছি।

তবে?

জয়ন্তের কাছে এসে সুন্দরবাবু তার কানে কানে বললেন, বাড়ির ভিতরে নিশ্চয়ই অপরাধীদের সহকারী আছে। হয়তো কোনও দ্বারবান বা বেয়ারা! সে খোঁজ পরে নেওয়া যাবে। আপাতত তাদের সবাইকে নজরবন্দি করে রাখা হয়েছে।

–আপনার গৌরচন্দ্রিকা শেষ হল?

–একটু বাকি আছে। কিন্তু সে যে একটু নয়, দস্তুরমতো গুরুতর একটু।

–অর্থাৎ?

–মিনিট পঁচিশ আগে আজ শিমুলতলা থেকে দ্বিজদাসের নামে রামবাবুর এই জরুরি টেলিগ্রাম এসেছে। পড়ে দেখো।

টেলিগ্রামখানা নিয়ে জয়ন্ত পাঠ করলে ও স্ত্রীর পীড়ার সংবাদ মিথ্যে। তার স্বাস্থ্য যথেষ্ট উন্নত। অবিলম্বেই কলকাতায় ফিরে যাচ্ছি।

জয়ন্ত মৌন মুখে ভাবছে, সুন্দরবাবু বললেন, রামবাবুকে কলকাতা থেকে যথাসময়ে সরাবার জন্যে কেউ তাকে মিথ্যে ভয় দেখিয়ে টেলিগ্রাম করেছিল। কে সে! নিশ্চয়ই অপরাধীদের কেউ!

জয়ন্ত বললে, আপনার অনুমানই সত্য বলে মনে হচ্ছে। দেখছি অপরাধীরা রীতিমতো আটঘাট বেঁধে কার্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েছে।

সুন্দরবাবু অগ্রসর হয়ে বললেন, এইবারে বাড়ির ভিতরে চলো।

প্রথমেই তারা গিয়ে ঢুকল রামবাবুর শয়নগৃহে। যার ভিতর থেকে টাকা ও গহনা চুরি গিয়েছে সেটা লোহার সিন্দুক নয় স্টিলের আলমারি।

আলমারিটা পরীক্ষা করে জয়ন্ত বললে, বোঝা যাচ্ছে, অপরাধীরা কাজ করে আধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে। তারা নিশ্চয়ই সঙ্গে করে এনেছিল একটা পোর্টাবল অক্সিজেন ট্যাঙ্ক। আগুনের শিখায় ইস্পাত গলিয়ে আলমারির পাল্লা খুলে ফেলা হয়েছে।

সুন্দরবাবু বললেন, একেবারে ঝানু অপরাধী। এত কাণ্ডকারখানার মধ্যে কোথাও আধখানা আঙুলের ছাপ পর্যন্ত রেখে যায়নি।

মানিক একটু বিস্মিত স্বরে বললে, অথচ আপনি বলছেন, তারা তাদের পায়ের ছাপ রেখে গিয়েছে।

ছাপ বলে ছাপ! স্পষ্ট ছাপ।

জয়ন্ত মাথা নাড়তে নাড়তে বললে, বড়ই সন্দেহজনক, বড়ই সন্দেহজনক?

সন্দেহজনক? কেন?

–কেন তা জানি না। এখন বাইরে চলুন।

বারান্দায় পড়েছিল রক্তাক্ত কাপড় দিয়ে ঢাকা একটা মূর্তি। হতভাগ্য দ্বিজদাসের মৃতদেহ। কাপড় সরিয়ে দেহটার ওপরে দৃষ্টিপাত করে জয়ন্ত বললে, বেশ বোঝা যাচ্ছে ছোরার এক আঘাতেই ভদ্রলোক মারা পড়েছেন।

সুন্দরবাবু বললে, বিয়োগান্ত দৃশ্যের কতকটা আমি আন্দাজ করতে পারছি। খুব সম্ভব অপরাধীরা যখন রামবাবুর ঘরের দরজা খোলবার চেষ্টা করেছিল, সেই সময়ে দ্বিজদাসের ঘুম ভেঙে যায়। তিনি ব্যাপার কী জানবার জন্যে তাড়াতাড়ি নিজের ঘর থেকে বেরিয়ে আসেন আর সেই সঙ্গে-সঙ্গেই আক্রান্ত হন।

জয়ন্ত দুই পা এগিয়ে বললে, এই পদচিহ্নগুলোর কথাই বলছেন?

–হ্যাঁ।

ছয়জোড়া পদচিহ্ন–তার মধ্যে তিনজোড়া খুব স্পষ্ট। দুইজন লোকের কর্দমাক্ত জুতোর ছাপ। চিহ্নগুলো আরম্ভ হয়েছে বারান্দার একটা নদর্মার কাছ থেকে।

হেঁট হয়ে দেখতে-দেখতে জয়ন্ত বললে, সুন্দরবাবু, গতকল্য রাত্রে এ অঞ্চলে কি বৃষ্টি পড়েছিল?

–নিশ্চয়ই নয়।

–আজ সকালের কাগজে আমি আবহাওয়ার রিপোর্ট দেখেছি। কাল কলকাতার কোথাও একফোঁটা বৃষ্টিও হয়নি।

হয়নি তো হয়নি। তা নিয়ে তোমার মাথাব্যথা কেন?

–মাথা থাকলেই মাথার ব্যথা হওয়া সম্ভব।

তার মানে তুমি বলতে চাও, আমার মাথা থেকেও নেই?

–আমি ও-সব কিছুই বলতে চাই না। আমি খালি এই কথাই আপনাকে মনে করিয়ে দিতে চাই যে, আগুন না থাকলে যেমন ধোঁয়া দেখা যায় না, তেমনি জল না পড়লে মানুষের জুতোও কর্দমাক্ত হয় না।

চমৎকৃতভাবে সুন্দরবাবু কেবলমাত্র উচ্চারণ করলেন–হুম!

জয়ন্ত বললে, বাড়ির কোনও বেয়ারাকে ডাকুন।

একজন বেয়ারা হাজির হল।

জয়ন্ত শুধোলে, নদর্মার কাছে দেখছি একটা মগ আর একটা খালি বালতি রয়েছে।

বেয়ারা বললে, আজ্ঞে, ব্যবহার করবার জন্যে সবসময়েই জলভরা বালতি থাকে।

কাল রাত্রেও ছিল?

আজ্ঞে হা হুজুর। কাল সন্ধের সময়ে আমি নিজের হাতে জলভরা বালতি রেখে গিয়েছি।

–কিন্তু বালতিতে জল নেই।

–তাহলে কাল রাতে কারুর জলের দরকার হয়েছিল।

–আচ্ছা, তুমি যাও। সুন্দরবাবু!

কী ভাই?

নর্দমার কাছটা পরীক্ষা করে দেখুন। ওখানে রয়েছে পাতলা কাদার প্রলেপ।

–এ থেকে কী বুঝব?

–এই পদচিহ্নগুলো হচ্ছে প্রদর্শনীর জন্যে।

–প্রদর্শনী?

–হ্যাঁ। অপরাধীরা এই পদচিহ্নগুলো আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখাতে চায়।

কারণ?

কারণ বোঝবার চেষ্টা করুন আপনি। এসো মানিক, এখানে আমাদের আর কোনও কাজ নেই।

জয়ন্ত ও মানিকের একসঙ্গে প্রস্থান। সুন্দরবাবু হতভম্বের মতো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মাথার টাক চুলকাতে লাগলেন।

.

পরের দিন সকালবেলায় মানিক এসে দেখলে, কী যেন ভাবতে-ভাবতে জয়ন্ত তার পুস্তকাগারের মেঝের ওপরে পদচারণা করছে।

মানিক বললে, তোমার মুখ দেখে বোধ হচ্ছে তুমি যেন কিছু মনে করবার চেষ্টা করছ, কিন্তু মনে করতে পারছ না!

–ঠিক তাই। একখানা বইয়ের নাম কিছুতেই স্মরণে আসছে না।

কীরকম বই?

সেইটেই তো প্রশ্ন। বইখানা কিনে পড়েছিলুম অনেকদিন আগে। আর একটা বিশেষ ঘটনার কথাও মনে আছে। কিন্তু বইখানার নাম মনে আনতে পারছি না বলে বুঝতে পারছি না, ঘটনাটা কাল্পনিক না সত্য কাহিনি।

–ঘটনাটা কাল্পনিক হলে কিছু ক্ষতি আছে?

–আছে বইকী, খুব আছে। সেটা কাল্পনিক ঘটনা হলে আমার অনুমানও অমূলক বলে প্রমাণিত হবে।

–অনুমানটা কি শুনতে পাই না?

–ভদ্রেশ্বরের বাগানে আমার প্রতি নিক্ষিপ্ত বুলেটটা এসেছিল কীরকম আগ্নেয়াস্ত্রের ভিতর থেকে, সেইটেই আমি বোঝবার চেষ্টা করছি।

মানিক অত্যন্ত বিস্মিত হল, কিন্তু মুখে কিছু বললে না। জয়ন্ত বইয়ের আলমারিগুলোর ভিতরে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত করতে করতে বারংবার এদিক-ওদিক আনাগোনা করতে লাগল। মানিক একখানা চেয়ারের ওপর বসে সেদিনের খবরের কাগজখানা টেনে নিলে। এইভাবে কেটে গেল প্রায় বিশ মিনিট।

হঠাৎ জয়ন্ত সানন্দে চিৎকার করে বলে উঠল, পেয়েছি।

কী পেয়েছ হে?

–সেই বইখানা।

কী বই?

–জোসেফ গোলামসাহেবের মাস্টার ম্যান-হান্টারসঅর্থাৎ ওস্তাদ মনুষ্য শিকারি। বইখানা প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দে।

–ওখানা কি উপন্যাস?

–মোটেই নয়! ওর আগাগোড়াই আছে কেবল সত্য ঘটনার পর সত্য ঘটনা। দস্তুরমতো অপরাধবিজ্ঞানের বই, কাল্পনিক কথা একটাও নেই।

–তাহলে তোমার অনুমান ভুল নয়?

–খুব সম্ভব তাই।

কীরকম আগ্নেয়াস্ত্র থেকে তোমাকে গুলি করা হয়েছিল? জয়ন্ত জবাব দেবার আগেই বেজে উঠল টেলিফোনের ঘণ্টা।

–হ্যালো!..আ-রে, আজ সকালেও ফোনে সুন্দরবাবু! ব্যাপার কী? এখনি আমাকে আপনার কাছে ছুটতে হবে? কেন? কাল রাত্রেও আবার একটা নরহত্যা হয়েছে? আঁ,–কে খুন হয়েছে বললে? এবারে স্বয়ং মণিমোহন? এবারের ঘটনাস্থলেও সেই পরিচিত পদচিহ্ন পাওয়া গিয়েছে। আচ্ছা, আমরা এখনি যাচ্ছি।

রিসিভারটা রেখে দিয়ে জয়ন্ত কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল গম্ভীর মুখে। তারপর ধীরে ধীরে বললে, মানিক সব শুনলে তো! ঘটনার স্রোত যে এমনি কোনও দিকেই ছুটবে, আমি তা কতকটা আন্দাজ করতে পেরেছিলুম। যবনিকা পড়তে আর বেশি দেরি নেই! নাও, এখন ওঠো।

.

সুপরিচিত অপরিচিত

তখন মর্গে স্থানান্তরিত হয়েছিল মণিমোহনের দেহ। জয়ন্ত ও মানিককে নিয়ে সুন্দরবাবু সেইখানে গিয়ে হাজির হলেন।

জয়ন্ত চমৎকৃত হয়ে লক্ষ করলে, ভদ্রেশ্বরের সঙ্গে মণিমোহনের আকৃতিগত সাদৃশ্য। একরকম দীর্ঘত, একরকম গঠন এবং প্রায় একরকম মুখ-চোখ-নাক। কেবল ভদ্রেশ্বরের জোড়া ভুরু মণিমোহনের জোড়া নয়। ভদ্রেশ্বরের চেয়ে মণিমোহনের রং একটু বেশি ফরসা। এবং মণিমোহনের চেয়ে ভদ্রেশ্বরের কপাল বেশি প্রশস্ত কিন্তু এই অল্পসল্প পার্থক্য চেষ্টা করলে খুব সহজেই ঢেকে ফেলা যায়।

জয়ন্ত বললে, দেখছি মণিমোহন মারা পড়েছে ছোরার আঘাতে।

সুন্দরবাবু বললেন, হ্যাঁ, ঠিক বুকের ওপরে মোক্ষম আঘাত। ডাক্তারের মতে, আঘাতের সঙ্গে-সঙ্গেই মৃত্যু হয়েছে, মণিমোহন হয়তো ছটফট করবারও সময় পায়নি!

–কোন সময়ে এর মৃত্যু হয়েছে, ডাক্তার সে সম্বন্ধে কোনও মত প্রকাশ করেছেন কি?

ডাক্তারির হিসাবে প্রকাশ, মণিমোহনের মৃত্যু হয়েছে অন্তত গতকল্যকার সন্ধ্যার আগে।

মৃতদেহ পাওয়া গিয়েছে কখন?

আজ ভোরবেলায়।

–আপনার মুখে শুনলাম, বালির কাছে গ্রান্ড ট্রাঙ্ক রোডের পাশে একটা সরু গলির ভিতরে মৃতদেহটা পাওয়া গিয়েছে। সে কীরকম গলি? সেখান দিয়ে কি লোক চলাচল হয় না?

–এ কথা জিজ্ঞাসা করছ কেন?

কাল সন্ধ্যার আগে খুন হয়েছে, অথচ লাশ পাওয়া গেছে আজ সকালে? জায়গাটা নিশ্চয়ই অত্যন্ত নির্জন।

না, জায়গাটা মোটেই নির্জন নয়। স্থানীয় লোকেরা বলে, কাল রাতদুপুরেও গলির ভিতরে লাশ-টাস কিছুই ছিল না।

–তাহলে মণিমোহন মারা পড়েছে অন্য কোনও জায়গায়। হত্যার অনেক পরে, গভীর রাতে তার দেহটা ওই গলির ভিতরে ফেলে দিয়ে যাওয়া হয়েছে।

জয়ন্ত, আগে আমিও ওই সন্দেহ করতে পারিনি। আমি ভেবেছিলুম, খুনটা হয়েছে। ওই গলিতেই। কিন্তু তারপর ডাক্তারের রিপোর্ট পেয়ে মত পরিবর্তন করতে বাধ্য হয়েছি। কিন্তু কিন্তু বলতে-বলতে সুন্দরবাবু ভুরু কুঁচকে মাথা চুলকোতে লাগলেন।

–থামলেন কেন? ভাবছেন কী?

–হুম! আমি ভাই একেবারেই কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে গিয়েছি।

–কেন?

সন্ধ্যার আগেই যদি মণিমোহনের মৃত্যু হয় থাকে, তবে রাত বারোটার পরেও তার মৃতদেহ থেকে কি রক্তের ধারা বইতে পারে?

–আপনার কথার অর্থ কী?

–মৃতদেহ যেখানে পাওয়া গিয়েছে সেখানকার মাটি ভিজে গিয়েছে রক্তের ধারায়।

–মুখ টিপে হেসে জয়ন্ত বললে, না, অতক্ষণ পরে মৃতদেহ থেকে রক্ত বেরুতে পারে না।

–তবে। ডাক্তার কি ভুল রিপোর্ট দিয়েছেন?

–উঁহু, সম্ভবত ডাক্তার ভুল করেননি। সুন্দরবাবু, আমি আর একটা ব্যাপার আন্দাজ করতে পারছি।

কী আন্দাজ?

–ফোনে আমাকে বললেন না ঘটনাস্থলে পাওয়া গিয়েছে সেই নিরুদ্দেশ অপরিচিত ব্যক্তির সুপরিচিত পদচিহ্ন?

হ্যাঁ। সেই পদচিহ্নগুলো।

–পাওয়া গিয়েছে রক্তমাখা মাটির উপরে? কেমন এই তো?

চরমবিস্ময়ে চক্ষু বিস্ফারিত করে সুন্দরবাবু বলে উঠলেন, কী আশ্চর্য, কেমন করে জানলে তুমি?

বললুম তো আন্দাজে।

–এ কীরকম আন্দাজ বাবা? এ যে মন্ত্রশক্তিকে হার মানায়!

–আমার আন্দাজ প্রায়ই সত্য হয়ে দাঁড়ায়, কারণ যুক্তি থেকেই তার উৎপত্তি।

ধন্য ভায়া। দাদা হয়েও তোমার পায়ে গড় করতে ইচ্ছে হচ্ছে। আচ্ছা, এখন কী করবে? ঘটনাস্থলটা একবার দেখে আসবে নাকি?

না সুন্দরবাবু, প্রয়োজন নেই। আমি মনে-মনে মামলাটা প্রায় সম্পূর্ণ করে ফেলেছি, কেবল একটু তদন্ত বাকি আছে। বিলম্বে কার্যহানির সম্ভাবনা, শুভস্য শীঘ্রম।

–আমাকে কী করতে বলো?

জনকয়েক লোক নিয়ে এখনি আমার সঙ্গে চলুন।

–কোথায় হে?

–এখনি দেখতে পাবেন।

.

জয়ন্তের নির্দেশে পুলিশের জিপগাড়ি এসে থামল শালিখার চন্দ্রনাথ রায়ের বাড়ির সামনে। সবিস্ময়ে সুন্দরবাবু শুধোলেন, জয়ন্ত তুমি কি চন্দুরের কাছেই এসেছ?

হ্যাঁ।

–তুমি কি ওর বিরুদ্ধে নতুন কোনও প্রমাণ পেয়েছ?

–কোনও প্রমাণই পাইনি।

–তবে?

–আমি চন্দ্রনাথের সঙ্গে কিছুক্ষণ আলাপ-আলোচনা করতে চাই।

আর আমরা কী করব?

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমাদের কথোপকথন শ্রবণ করবেন।

এমন সময়ে বোধহয় গাড়ি থামার শব্দ শুনেই চন্দ্রনাথ স্বয়ং বেরিয়ে এসে দাঁড়াল দোতলার বারান্দায়। তারপর ওপর থেকে মুখ বাড়িয়ে দেখে বললে, আরে! আবার আমার দ্বারে সুন্দরবাবুর দল!

সুন্দরবাবু বললেন,আজ্ঞে হ্যাঁ, আপনাকে একটা খবর দিতে এসেছি। নেমে আসুন।

মিনিট দুই পরে চন্দ্রনাথ নীচে নেমে রাস্তায় বেরিয়ে এল। হাতে তার সেই মোটা লাঠিগাছা।

জয়ন্ত বললে, মশাই কি বাড়িতেও ওই বাঘ-মারা লাঠিছাড়া হয়ে থাকেন না?

চন্দ্রনাথ বললে, কোমরে হঠাৎ লাম্বেগোর ব্যথা হয়েছে। লাঠি ছেড়ে চলতে কষ্ট হয়। সুন্দরবাবু, কী একটা খবরের কথা বলছিলেন না?

সুন্দরবাবু বললেন, আমাদের রাস্তায় দাঁড়িয়েই কথাবার্তা কইতে হবে নাকি? আপনি কি আমাদের ধুলোপায়েই বিদায় করতে চান?

চন্দ্রনাথ নাচারের মতো বললে, বেশ, তবে বাড়ির ভিতরে আসুন।

সকলে বৈঠকখানায় গিয়ে আসন গ্রহণ করলে পর চন্দ্রনাথ বললে, আপনারা এমনকী জরুরি খবর দেবার জন্যে এতদূর ছুটে এসেছেন?

সুন্দরবাবু বললেন, আপনার বন্ধু মণিমোহনকে মনে আছে তো?

কিন্তু আপনাদের সঙ্গে দেখা হবার পর থেকে তার সঙ্গে আর আমার দেখা হয়নি। জানি না সে কোথায় অজ্ঞাতবাস করছে।

–আমরা এত দিন পরে তাকে খুঁজে পেয়েছি, কিন্তু জীবন্ত অবস্থায় নয়।

কী বলছেন!

–হ্যাঁ, গতকল্য কে যেন তাকে খুন করেছে।

–শুনে অত্যন্ত দুঃখিত হলুম। অপরাধীর কোনও সন্ধান পেয়েছেন?

–না। মণিমোহনের সঙ্গে শত্রুতা ছিল, এমন কোনও লোককে আপনি জানেন?

তার কোনও শত্রু বা বন্ধুকেই আমি চিনি না, কারণ তার সঙ্গে বেশিদিন আমার আলাপ হয়নি।

জয়ন্ত এবার মুখ খুললে। বললে, আপনার বাড়িতে কয়খানা ঘর আছে চন্দ্রনাথবাবু?

দশখানা।

–ঘরগুলো একবার দেখাবেন?

–আপনার কৌতূহল একটু অদ্ভুত নয় কি? –

-কেন, দেখাতে কোনও আপত্তি আছে? –

-কিছু না। আসুন।

একে একে সব ঘর দেখিয়ে চন্দ্রনাথ সবশেষে দোতলার একখানা ঘরে ঢুকে বললে, এখানা আমার শোবার ঘর।

জয়ন্ত একবার চারদিকে চোখ বুলিয়ে নিলে। তারপর এক দিকে চেয়ে বললে, ওখানে রয়েছে পরপর সাত জোড়া জুতো। সব জুতোই আপনার?

শুকনো হাসি হেসে চন্দ্রনাথ বললে, হ্যাঁ। আমার কিঞ্চিৎ পাদুকাবিলাস আছে।

জয়ন্ত জুতোগুলোর সামনে গিয়ে বসে পড়ল। একে-একে সব জুতো হাতে করে তুলে নিয়ে উলটেপালটে পরীক্ষা করে বললে, বাঃ, বেশ জুতোগুলো! চন্দ্রবাবুর পছন্দ আছে বটে!

চন্দ্রনাথ ভাবহীন মুখে গম্ভীর স্বরে বললে, মশায়ের আর কিছু জ্ঞাতব্য বা বক্তব্য আছে?

জয়ন্ত উঠে দাঁড়িয়ে বললে–নীচেয় ফিরে যাই চলুন।

সকলে আবার বৈঠকখানায় এল।

সুন্দরবাবুর এক সহকারী কর্মচারী একটা লোককে নিয়ে দাঁড়িয়েছিল সেইখানে। বললে, স্যার, এই লোকটা বাড়ির বাইরে যাচ্ছিল, আমরা যেতে দিইনি।

লোকটা বললে, আমি এই বাড়ির চাকর। বাজারে যাচ্ছি।

সহকারী বললে, কিন্তু ও বাজারে যাচ্ছে রেশন ব্যাগের ভিতরে একজোড়া জুতো নিয়ে!

জয়ন্ত সাগ্রহে বললে, জুতো! দেখি দেখি।

চন্দ্রনাথ বললে, কোথাকার একটা উটকো লোক আজ ভোরে রেশন ব্যাগসুদ্ধ ওই জুতোজোড়া আমার বৈঠকখানায় ফেলে গিয়েছিল। তাই চাকরকে আমি বলেছিলুম সে যেন বাজারে যাবারসময় জুতোজোড়া রাস্তায় ফেলে দিয়ে যায়।

জয়ন্ত নিরুত্তর মুখে একখানা আতস কাচের সাহায্যে জুতোজোড়া খানিকক্ষণ পরীক্ষা। করে বললে, সুন্দরবাবু গাড়িতে ওঠবার সময় আপনাকে কী আনতে বলেছিলাম মনে আছে?

–সেই অপরিচিত ব্যক্তির পদচিহ্নের ছাঁচ তো? এনেছি।

তার সঙ্গে এই জুতোজোড়া মিলিয়ে দেখুন।

গাড়ি থেকে ছাঁচ আনানো এবং জুতোর সঙ্গে মেলানো হল। অবিকল মিলে গেল– একচুল এদিক-ওদিক হল না।

সুন্দরবাবু উত্তেজিত কণ্ঠে বলে উঠলেন, হত্যাকারীর জুতো।

জয়ন্ত বললে, সে বিষয়ে কোনওই সন্দেহ নেই। জুতোর তলার দিকে তাকালেই দেখতে পাবেন জায়গায় জায়গায় শুকনো রক্তের দাগ। তার মানে হচ্ছে কাল মণিমোহনকে বধ করবার পরেও এই জুতোজোড়া ব্যবহার করা হয়েছিল। এই জুতো সংগ্রহ করবার জন্যেই আমার এখানে আগমন।

চন্দ্রনাথ চমকে উঠে বললে, কী বললেন? আপনি জানতেন যে, ওই জুতো আছে আমার এইখানেই?

–ঠিক জানতুম বলতে পারি না, তবে এইরকম একটা সন্দেহ করেছিলুম বটে!

চন্দ্রনাথ খাপ্পা হয়ে বলে উঠল, এতক্ষণ আমার ধারণা ছিল কোনও উটকো লোক জুতোজোড়া আমার বৈঠকখানায় ফেলে রেখে গিয়েছে। এখন বুঝতে পারছি, এ হচ্ছে

পুলিশের কারসাজি। কিন্তু আপনাদের সমস্ত কূটকৌশলই ব্যর্থ হবে। দেখুন ওই জুতোর সঙ্গে আমার পা মিলিয়ে। আমি বলছি এ জুতো আমার নয়।

জয়ন্ত সহাস্যে বললে, আমি জানি ও-জুতোর মাপ আপনার পায়ের চেয়ে বড়। কিন্তু আমি কেবল জুতোর আসল গুপ্তকথাই জানি না, বোধ হচ্ছে আপনার ওই লাঠির গুপ্তকথাও আমার কাছে অবিদিত নেই। সুন্দরবাবু, আপনি এখন অনায়াসেই চন্দ্রনাথকে থানায় ধরে নিয়ে যেতে পারেন।

আচম্বিতে চন্দ্রনাথের মুখ হয়ে উঠল বীভৎস এক দানবের মতো। সঙ্গে সঙ্গে ফস করে সে লাঠিগাছা দুই হাতে কোমর-বরাবর উঁচু করে তুলে ধরলে–

এবং তৎক্ষণাৎ একটা রিভলভার গর্জন করে উঠল ও পরমুহূর্তে লাঠিগাছা তার হাত থেকে খসে মেঝের ওপরে পড়ে গেল সশব্দে। চন্দ্রনাথের ডান হাতের কবজির ওপরে ফুটে উঠল রক্তের রেখা।

চারদিকে তাকাতে-তাকাতে সুন্দরবাবু সবিস্ময়ে বলে উঠলেন, রিভলভার ছুড়লে কে, রিভলভার ছুড়লে কে?

জয়ন্ত প্রশান্ত কণ্ঠে বললে, সে কথা পরে শুনবেন সুন্দরবাবু। এখন চট করে লাঠিগাছা তুলে নিন দেখি। কিন্তু খুব সাবধান বোধহয় ওটা লাঠি নয়–কোনও সাংঘাতিক ভয়াবহ অস্ত্র।

.

পদচিহ্ন রহস্য

চন্দ্রনাথের পরিত্যক্ত লাঠিগাছাটা মাটির ওপর থেকে তুলে নিয়ে সুন্দরবাবু আবার বললেন, কিন্তু রিভলভার ছুড়লে কে?

জয়ন্ত হাসতে-হাসতে বললে, রিভলভার ছুঁড়েছি আমি সুন্দরবাবু।

সুন্দরবাবু মাথা নেড়ে বললেন, হতেই পারে না। যখন রিভলভারের আওয়াজ হয়। তখন তোমার ডান হাত ছিল জামার পকেটের ভিতরেই।

–ঠিক দেখেছেন। এখনও আমার ডান হাত জামার পকেটের ভিতরেই আছে।

তবে?

পকেটের ভিতর থেকেই আমি রিভলভার ছুঁড়েছিলুম।

–সে কী হে?

–এই দেখুন, আমার পকেট ছাদা করে রিভলবারের গুলিটা বাইরে বেরিয়ে এসেছে।

হুম!

চন্দ্রনাথকে আমি বিশ্বাস করিনি, আর আমার সবচেয়ে বেশি সন্দেহ ছিল ওর ওই মোটা লাঠিগাছার উপরে। আমি জানতুম, সে যদি হঠাৎ কোনও চালাকি খেলে বসে, তাহলে পকেট থেকে আর রিভলভার বার করবার সময় পাব না। তাই পকেটের ভিতরেই রিভলভার ধরে আমি আগে থাকতে তৈরি হয়েছিলুম।

ধন্যি ছেলে যা হোক!

–না সুন্দরবাবু, ব্যাপারটায় নতুনত্ব নেই কিছু। চোখের পলক পড়বার আগেই কাজ সারবার জন্যে মার্কিন গুন্ডাদের মধ্যে এই নিয়মই প্রচলিত আছে। এখন ও কথা থাক। লাঠিগাছটা আমার হাতে দিয়ে আগে চন্দ্রনাথকে গ্রেপ্তার করুন।

সুন্দরবাবুর হুকুমে তখনই পাহারাওয়ালা এসে চন্দ্রনাথকে ঘিরে দাঁড়াল।

দাঁতে দাঁতে ঘষতে ঘষতে চন্দ্রনাথ বললে, বটে, বটে! আমার বিরুদ্ধে কী প্রমাণ পেয়েছ তোমরা?

জয়ন্ত জবাব না দিয়ে চন্দ্রনাথের লাঠিগাছা নিয়ে নাড়াচাড়া করতে লাগল। তারপর সকলের দিকে পিছন ফিরে জানলার ধারে গিয়ে দাঁড়িয়ে লাঠিগাছা আকাশের দিকে উঁচু করে তুলে ধরলে। তারপরেই ঘরের সবাইকে চমকে দিয়ে গুড়ুম করে একটা আওয়াজ হল।

সুন্দরবাবু আঁতকে বলে উঠলেন, বন্দুক ছুড়লে কে, বন্দুক ছুড়লে কে?

জয়ন্ত ফিরে দাঁড়িয়ে বললে, আমি।

সুন্দরবাবু সবিস্ময়ে বললেন, মানে? বন্দুকটাও তোমার পকেটের ভিতরে লুকিয়ে রেখেছ নাকি?

তখন ধূমায়মান লাঠিগাছা দেখিয়ে জয়ন্ত বললে, না। আমি ছুঁড়েছি এই লাঠি-বন্দুকটা।

লাঠি আবার বন্দুকে পরিণত হতে পারে নাকি! গুপ্তির কথা শুনেছি বটে, লাঠির ভিতরে লুকানো থাকে ছোট তলোয়ার। কিন্তু লাঠি-বন্দুক আবার কী চীজ, বাবা!

হ্যাঁ সুন্দরবাবু, আমার হাতে যা দেখছেন তা লাঠির ছদ্মবেশে বন্দুক ছাড়া আর কিছুই নয়। এই দেখুন লাঠির রুপোবাঁধানো মণ্ডি। তার তলার এই যে দেখছেন সোনার ব্যান্ড বা বন্ধনী, আঙুল দিয়ে এটা একটু সরানো যায়। কিন্তু সরাবার সঙ্গে সঙ্গেই লাঠির ভিতরে যে টিগার বা টিপকল আছে, সেটা পড়ে যাবে আর ভিতর থেকে বেরিয়ে পড়বে বুলেটটা। কী হে চন্দ্রনাথ তাই নয় কি?

চন্দ্রনাথ ক্রুদ্ধ মুখে গুম হয়ে দাঁড়িয়ে রইল, কোনও উত্তর দিল না।

সুন্দরবাবু চমৎকৃত হয়ে বললেন, এমন আজব বন্দুকের কথা কখনও তো শুনিনি।

জয়ন্ত বললে, না শোনবারই কথা! এ দেশে এ রকম বন্দুক থাকতে পারে আমিও আগে তা জানতুম না।

–তবে তুমি লাঠির গুপ্তকথা আবিষ্কার করলে কেমন করে?

বলছি শুনুন। এই মোটা লাঠিগাছা দেখলেই অসাধারণ বলে মনে হয় না কি? এ রকম লাঠি নিয়ে কোনও শৌখীন বাবুই হাওয়া খেতে বেরোয় না। লাঠির ওই অসাধারণত্ব প্রথম দিনেই আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। কিন্তু আমি তখন ওটাকে ভেবেছিলুম সাধারণ গুপ্তি জাতীয় কোনও অস্ত্র। তারপর আমার প্রথম সন্দেহ জাগ্রত হয় ভদ্রেশ্বরের বাগানে গিয়ে।

–কেন, সেখানে তো আমরাও ছিলুম, আমরা তো চন্দ্রনাথের লাঠিকে তখনও সন্দেহজনক বলে মনে করতে পারিনি।

–গুটিকয় কথা ভেবে দেখুন। ভদ্রেশ্বরের বাগানে আমাদের কোনওই বন্দুকধারী শত্রু ছিল না। মণিমোহন পলাতক, ভদ্রেশ্বর বন্দি, যেদিক থেকে আমাকে লক্ষ্য করে গুলি নিক্ষিপ্ত হয় সেদিকে দাঁড়িয়েছিল কেবল চন্দ্রনাথ। কিন্তু তার হাতে ছিল মাত্র এই লাঠিগাছা। বাগান তল্লাশ করেও অন্য কোনও লোক বা বন্দুক খুঁজে পাওয়া যায়নি। তবে বন্দুক ছুড়লে কে? একমাত্র উত্তর হতে পারে, চন্দ্রনাথ। কিন্তু তার কাছেও ওই লাঠি ছাড়া আর কোনও অস্ত্রই ছিল না। গুলি তো আকাশ থেকে খসে পড়েনি, তাই সর্বপ্রথম আমার মনে সন্দেহ জাগে, তবে কি চন্দ্রনাথের ওই লাঠির ভিতরেই কোনও রহস্য নিহিত আছে? বাড়িতে ফিরে এসে এই নিয়ে ভাবতে-ভাবতে হঠাৎ মনে পড়ে গেল, অনেকদিন আগে কী একখানা ইংরেজি কেতাবে অদ্ভুত একটা লাঠির কথা পাঠ করেছিলুম। কিন্তু বইখানার নামটা প্রথমে মনে পড়েনি। তারপর আমার লাইব্রেরির আলমারিগুলোর ভিতরে খুঁজতে খুঁজতে হঠাৎ যখন বইখানা চোখে পড়ে গেল, তখন মানিকও সেখানে হাজির ছিল। কী হে মানিক বইখানার নাম তুমি এর মধ্যে ভুলে যাওনি তো।

মানিক বললে, নিশ্চয়ই ভুলে যাইনি! বইখানা হচ্ছে জোসেফ গোল্লামসাহেবের মাস্টারম্যান হান্টার্স।

–ঠিক। ওখানা উপন্যাস নয়, সত্য ঘটনায় পরিপূর্ণ অপরাধ বিজ্ঞানের বই। তারই পাতা ওলটাতে-ওলটাতে দ্বাদশ পরিচ্ছেদে প্যারিসের অপরাধ জাদুঘর-এর বর্ণনার মধ্যে খুঁজে পেলুম চন্দ্রনাথের এই লাঠির জুড়ি।

সুন্দরবাবু আগ্রহভরে বললেন, কীরকম, কী রকম?

সম্পূর্ণ ঘটনায় কথা পরে আপনি বিস্তৃতভাবে বইখানা পাঠ করলেই জানতে পারবেন, আপাতত আমি সংক্ষেপেই তার কথা বলব। ফ্রান্সে একবার একটা গার্ডেন-পার্টিতে জনৈক ব্যক্তি কোনও অজানা আততায়ীর দ্বারা নিক্ষিপ্ত গুলিতে নিহত হয়। তখনি ঘটনাস্থলে পুলিশ আসে আর সারা বাগান আর প্রত্যেক নিমন্ত্রিত ব্যক্তির জামা-কাপড় তল্লাশ করে, কিন্তু বন্দুক বা কোনওরকম আগ্নেয়াস্ত্রই খুঁজে পায় না। অন্য কোনও সূত্র না পেয়ে গোয়েন্দারা খোঁজ নিতে লাগল, নিহত ব্যক্তির সঙ্গে কারুর বিশেষ শত্রুতা আছে কি না! ফলে এক ব্যক্তির ওপরে পুলিশের সন্দেহ হয়। তারপর তার বাড়ি খানাতল্লাশ করে আবিষ্কৃত হয় এমন একগাছা লাঠি, যা অবিকল চন্দ্রনাথের এই লাঠি গাছারই মতো।

সুন্দরবাবু বললেন, তুমি কী বলতে চাও, চন্দ্রনাথ ওই রকম সর্বনেশে লাঠি তৈরি করেছে।

–সে নিজে হয়তো তৈরি করেনি, হয়তো ইউরোপ থেকেই অস্ত্রটা আমদানি করেছে।

–তাহলে চন্দ্রনাথকে বড় জোর তোমাকে খুন করবার চেষ্টা করেছে বলে আমরা চালান দিতে পারি। কিন্তু আমাদের আসল মামলা তো এখনও রয়ে গেল যে তিমিরে সেই তিমিরেই!

রুপোর নস্যদানি বার করে নস্য নিতে-নিতে জয়ন্ত বললে, মোটেই নয়! চন্দ্রনাথের বাড়িতে আজ যে জুতোজোড়া খুঁজে পেয়েছি, আসল মামলার কিনারা হবে তার সাহায্যেই।

–সে কী হে, ও জুতোর মাপ যে চন্দ্রনাথের পায়ের মাপের চেয়ে বড়!

–হ্যাঁ, কিন্তু কোনও ঘটনাস্থলে যাবার সময়ে চন্দ্রনাথ নিশ্চয়ই ওই জুতোর ভিতরে কাগজের নুটি বা প্যাড গুঁজে দিয়ে কিছুক্ষণের জন্যে কোনওরকমে জুতোজোড়া ব্যবহার করত।

–কেন?

–পুলিশকে ভোলাবার জন্যে।

–কেমন করে এটা জানতে পেরেছ?

রামময়বাবুর বাড়িতে যে চুরি আর হত্যাকাণ্ড হয়, সেদিন বৃষ্টি হয়নি তবু ঘটনাস্থলে পাওয়া গিয়েছিল মণিমোহনের আর এই জুতোজোড়ার কাদামাখা ছাপ। তারপর দেখা গেল, নদর্মার কাছে গিয়ে বালতির জল ঢেলে ধুলোমাখা জুতো ভিজিয়ে কারা ইচ্ছে করেই সেই পদচিহ্নগুলো সৃষ্টি করেছে। মনে আছে সুন্দরবাবু, তখনি আপনাকে আমি বলেছিলুম, অপরাধীরা। এই পদচিহ্নগুলো আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখাতে চায়!

হুম্।

তারপর যেখানে মণিমোহন খুন হয় সেখানেও এই জুতোজোড়ার ছাপ পাওয়া যায় রক্তমাখা মাটির উপরে, অথচ সেখানে রক্ত থাকবার কথা নয়, কারণ লাশটাকে হত্যাকাণ্ডের অনেক পরে সেখানে স্থানান্তরিত করা হয়েছিল। আসলে সে রক্তও আমদানি করা। সেখানেও হত্যাকারী এই জুতোজোড়ার ছাপ দেখিয়ে আমাদের ভোলাতে চেয়েছিল। এখন ব্যাপারটা বুঝতে পারছেন?

–খানিক খানিক, সবটা নয়।

–গোড়া থেকে ভেবে দেখুন। চন্দ্রনাথের কুকর্মের সহকারী হল মণিমোহন। প্রথমেই কে সরকারের জুয়েলারি ফার্মে চুরি। তারপর নন্দলালকে হত্যা করে তাকে মণিমোহন বলে

চালাবার চেষ্টা। সেখানেও নন্দলালের, মণিমোহনের আর অজ্ঞাত ব্যক্তির জুতোজোড়ার ছাপ পাওয়া যায়। তারপর ধরা পড়ে মণিমোহন খুন হয়নি, মারা পড়েছে নন্দলালই। পুলিশের সন্দেহ যায় মণিমোহন আর এক অজ্ঞাত ব্যক্তির দিকে। চন্দ্রনাথের উদ্দেশ্যই ছিল তাই।

তারপর রামময়বাবুর বাড়িতে খুন, পঞ্চাশ হাজার টাকা আর ত্রিশ হাজার টাকার জড়োয়া গহনা চুরি। সেখানেও পাওয়া গেল মণিমোহনের আর সেই অজ্ঞাত ব্যক্তির জুতোর ছাপ। তারপর ভিতরের ব্যাপারটা ঠিক ধরতে পারছি না বটে, কিন্তু খুব সম্ভব চোরাই টাকা গহনার ভাগ-বাটোয়ারা নিয়ে মণিমোহনের সঙ্গে চন্দ্রনাথের ঝগড়া হয়, যার ফলে মণিমোহনের অকালমৃত্যু। লাশ অন্যত্র পাঠিয়ে সেখানে আবার পুলিশের অজ্ঞাত সেই ব্যক্তির জুতোর ছাপ রেখে আসা হল। ফলে চন্দ্রনাথ ভেবেছিল সে নিজে থাকবে নিরাপদে, আর পুলিশ খুঁজে মরবে এমন কোনও ব্যক্তিকে পৃথিবীতে যার অস্তিত্ব নেই।

চন্দ্রনাথ ঝাঁঝালো গলায় বললে, ও জুতো যে আমার, সেটা প্রমাণ করবে কে?

জয়ন্ত বললে, সে ভার পুলিশের হাতে দিয়ে তুমি নিশ্চিন্ত হয়ে থাকতে পারো। এই জুতোজোড়া পাওয়া গিয়েছে তোমার বাড়িতে। পুলিশ দেখেই জুতোজোড়া তুমি সরিয়ে ফেলতে গিয়েছিলে। তার ওপরে এমন আরও অনেক সারকামস্ট্যানসিয়াল এডিভেন্স বা অবস্থাঘটিত প্রমাণও আছে, তোমাকে ফাঁসিকাঠে দোলাবার পক্ষে যা হবে যথেষ্ট।

সুন্দরবাবু বললেন, যেমন বুনো ওল, তেমনি বাঘা তেঁতুল। যেমন কুকুর তেমনি মুগুর। হুম, জয়ন্তের মতো রোজা না হলে চন্দুরের মতো ভূতকে শায়েস্তা করতে পারে কে?